অসময়ে

– অনিন্দিতা হক গোধুলী

তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে ওঠে হঠাৎই। সে ছিল কথা বলার ওস্তাদ। ছেলে হয়েও সে কথার পিঠে কথা বলতে পারতো। আর সহজেই মানুষকে করতো প্রভাবিত। তার সঙ্গে প্রথম দেখা কলেজের এক আনন্দঘন মুহূর্তে। দেখি সিড়িতে বসে সে একা সিগারেট হাতে উদাসীন আকাশ পানে। বন্ধুরা তার কাছে আসছে, যাচ্ছে, কিন্তু সে বসেই আছে নিশ্চুপ। স্বাভাবিকভাবেই আমি এবং আমার বান্ধবীরা গেলাম তাকে টিজ করতে। কেননা আমাদের একটা বদঅভ্যাস মানুষকে জ্বালাতন করা।

তাকে বললাম, একা কেন ভাইয়া, কি ভাবছেন, কবিতা লেখেন নাকি।

সে উত্তরে বললো, একা না তো, সিগারেট তো আছেই।

বললাম, সিগারেট তো সঙ্গ দিতে পারে না।

আপনার ধারণা আমি একা। কিন্তু আমার থিওরি বলছে, আমি কখনোই একা ছিলাম না। তবে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমি চিড়িয়াখানার বন্দী কিছু প্রাণীর সঙ্গ পাচ্ছি। সে বললো।

প্রচণ্ড রাগে তাকে কিছু বলতে যাবার আগেই তার বন্ধুরা হাজির।

আমি তাকে ফোন নাম্বার দিয়ে বললাম, ফোন করবেন। তখন উত্তর দেবো কে বাইরে আর কে খাচার ভেতরে।

বিশ্বাস ছিল সে ফোন করবে। কেননা আমি অপরূপা না হলেও অসুন্দরী ছিলাম না। সে ফোন করতো না। আর কলেজে দেখা হলেও কথা বলার সুযোগ পেতাম না। দলের ছেলেরা সব সময় তাকে ঘিরে থাকতো। সে ছিল দলের মূল ক্যাডার। মিছিল মিটিংয়ে দেখা না গেলেও তার ব্যস্ততার শেষ ছিল না।

অনেকটা কষ্ট করে তার ফোন নাম্বার যোগাড় করে তাকে ফোন করেছিলাম। অজানা মুগ্ধতায় তাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। সে যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে খুব শিগগিরই বড় ধরনের পরিচয়ে পরিচিত হতে যাচ্ছে। আমার প্রেম তার মনে যতোটা আসন পেতে বসেছিল তারচেয়ে বেশি ছিল দলীয় কর্মকাণ্ড। তার উৎসাহ তেমন ছিল না। সে জানতো, এ সম্পর্ক বেশি দিন টিকবে না, আমার নাকি সবটাই ছিল মোহ।

প্রচণ্ড ভালোবাসতো বলেই হয়তো চাইনি, দুঃখগুলো কখনো আমায় ছুয়ে যাক। বাধ্য হয়েই তাকে শর্ত দিয়েছিলাম যদি রাজনীতি বাদ দিতে পারে তাহলেই তার সঙ্গে সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখা সম্ভব। ক্রমেই সে আরো গভীরভাবে জড়িয়ে গেল।

তাকে বললাম, হয় রাজনীতি, না হয় আমাকে, এই দুয়ের মাঝে যে কোনো একটা বেছে নাও।

তার সরাসরি উত্তর, সিদ্ধান্ত তুমিই নেবে।

মা বাবা জেনে যাওয়ায় তড়িঘড়ি করে আমারই এক কাজিনের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেন। বাবা মায়ের অভিমান এবং তার এ অপারগতা আমাকে বাধ্য করে বিয়েতে মত দিতে।

আজ আমি এক সন্তানের মা, অন্যের গৃহিণী। আমার স্বামী জেনেশুনেই বিয়ে করেছে। কখনো কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়নি তার কাছ থেকে। সেও বিয়েতে বাধা দেয়নি। একই শহরে থাকি বলে দেখা হয় মাঝে মধ্যে, কথা হয় না। সে ঠিক আগের মতো আছে। সেই হাতে ধরা সিগারেট, অভিমানী দুই চোখে আকাশ খোজা। শুধু বাদ দিয়েছে রাজনীতি করা। এখন সে ব্যবসায়ী। বড় অসময়ে সে ভালো হয়ে গেছে।

ভাবছি তার সঙ্গে দেখা করে বলবো, কেন ভালো হয়ে গেলে? তবে হলেই যদি কিছুদিন আগে হলে না কেন?

রাজশাহী থেকে

কাকতালীয়

– এস.এম. শহীদুল ইসলাম হেবেন

ছেলেটি কোরআনে হাফেজ। টাইটেল কিংবা দাখিল পর্যায়ে মাদ্রাসায় পড়ে। ক্লাস ফোরে পড়ুয়া আমার ছেলে শাফিনকে সে সপ্তাহে দুই দিন করে কোরআন ও নামাজ পড়া শেখায়। বেশ কয়েক মাস ধরে পড়াচ্ছে। তার মাদ্রাসার পরীক্ষা, শাফিনের স্কুলের পরীক্ষা ইত্যাদি কারণে আরবি শিক্ষার গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। মাসে গড়ে সে চার পাচ দিনের বেশি পড়াতে আসে না। শাফিন এ শিক্ষককে মোটেই ভয় পায় না, বরং দুষ্টুমি করে। প্রায় প্রতিদিন তার সঙ্গে শাফিনের হাসি গল্পের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। এতে শিক্ষকের ওপর আমার গিন্নি নাখোশ এবং এর বদলে একটু বয়স্ক হুজুর রাখার পক্ষে সে। তার ধারণা বয়স্ক, কাঠখোট্টা টাইপের হুজুর হলে শাফিন ভয় পাবে এবং কোরআন শেখা দ্রুততর হবে।

আমি বলি, থাক না, ধীরে সুস্থেই পড়াক। আমরা যে সামান্য পারিশ্রমিক দিই তাতে এর চেয়ে বেশি দিন পড়াতে আসতে গেলে তার যাতায়াত খরচই টিকবে না। আমরা জানি, সে ভালো, সম্ভ্রান্ত এবং সচ্ছল পরিবারের ছেলে। বলা যায়, শখে টিউশনি করছে। ছেলেটির সঙ্গে আমার কদাচিৎ দেখা হয়। তাই ভুলে যাই যে, শাফিনের একজন আরবি শিক্ষক আছে।

গত জুলাই মাসে শাফিন জ্বরে আক্রান্ত হলো। একনাগাড়ে ছয় সাত দিন ধরে ১০২ ডিগ্রি জ্বর। ডেঙ্গু জ্বর কি না এটা নিশ্চিত হতে ডাক্তারের পরামর্শে রক্ত পরীক্ষা করিয়েছি।

ব্লাড কাউন্ট দেখে ডাক্তার বললেন, ডেঙ্গু নেই। ব্লাড কালচারের রিপোর্ট ছাড়া রোগ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। এদিকে আমার ছেলে সাত দিন ধরে কিছু খেতে পারছে না। পানি খেলেও বমি করছে। শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে। ধরে ধরে বাথরুমে নিতে হয়।

ডাক্তার বলেছেন, অল্প করে হলেও তাকে খাওয়াতে হবে। দুর্বল হতে দেয়া চলবে না। না হলে হাসপাতালে ভর্তি করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

আমি অফিস ছুটি নিয়ে ছেলের কাছে থাকছি সারাক্ষণ। আদর করে, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করছি। সেদিন বিকেলে জ্বর মেপে শাফিনের গা স্পঞ্জ করে দিচ্ছিলাম। এই সময় কলিংবেল বাজলো।

কাজের মেয়ে বললো, শাফিনের হুজুর এসেছে। বসার ঘরে আছে। শাফিনকে দেখতে চায়।

গত দুই সপ্তাহে হুজুর একদিনও আসেনি। আমার স্ত্রী বিরক্তি প্রকাশ করলো।

হুজুরকে ভেতরে নিয়ে আসতে বললাম।

ছেলেটি ভেতরে এসে সালাম দিয়ে চেয়ারে বসলো। কতোদিন ধরে তার জ্বর চলছে জিজ্ঞাসা করলো। আমি জানলাম আজ আট দিন হলো।

এটা শুনে সে বললো, আ..ট দিন! এতোদিন যাবৎ জ্বর! ডাক্তার দেখানো হয়নি?

তাকে বিস্তারিত জানালাম। এক পর্যায়ে খেয়াল করলাম ছেলেটি আমার কোনো কথাই শুনছে বলে মনে হচ্ছে না। ও এক দৃষ্টিতে শাফিনের আধবোজা চোখের দিকে চেয়ে আছে। আর তার দুই চোখ পানিতে ভরে উঠেছে।

চোখের পানি আড়াল করতে রুমালে মুখ লুকানোর চেষ্টা করে সে বললো, আপনারা জানেন না, আমি তাকে কতো আদর করি। আমি অন্য কাউকে পড়াই না। আব্বা আম্মা চান না যে, আমি টিউশনি করি। আমি এখানে পড়াই শুধু তার জন্য। তাকে পছন্দ করি সেই জন্য। তার কথা, তার দুষ্টুমি আমার খুব ভালো লাগে। আপনারা পড়াতে না বললেও আমি আসবো। শাফিনকে দেখতে আসবো।

শেষের কথাগুলোর বলতে তার গলাটা কেমন ধরে গেল। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারছিলাম না। সালাম দেয়া ছাড়া যে ছেলেটি কোনো কথা বলে না তার এই প্রতিক্রিয়া দেখে হতবাক হয়ে গেলাম। এ পরিস্থিতিতে কি বলবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বরং আমারও কান্না পেতে লাগলো।

শাফিনকে ডাকলাম, শাফিন দেখো তোমার হুজুর এসেছেন।

শাফিন অতি কষ্টে চোখ খুলে হুজুরকে দেখে এক টুকরো মলিন হাসি হাসলো।

শাফিনের মাথায় হাত রেখে হুজুর কি যেন দোয়া পড়ে তার বুকে ফু দিল। আমার কাছে এক গ্লাস পানি চেয়ে বললো, একটু বড় দোয়া পড়ে পানি পড়া দেবো। সামান্য সময় লাগবে, কোনো অসুবিধা হবে আপনাদের?

অসুবিধা হবে না। বললাম।

পনেরো কুড়ি মিনিট পড়ে হুজুর পানির গ্লাসটি আমার হাতে দিয়ে বললো, শাফিনকে পানিটুকু এখনি খাইয়ে দিন। ইনশাআল্লাহ ও দ্রুত সেরে উঠবে।

হুজুর চলে গেলে শাফিনকে উঠিয়ে পানিটা খাওয়ালাম। প্রচণ্ড অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে খেলো। তখনো ১০১ ডিগ্রি-র উপর তার জ্বর। পানি খেতে তার কসরত দেখে বুঝতে পারছিলাম এ পানি সে পেটে রাখতে পারবে না, বরাবরের মতো বমি করে ফেলবে। হলোও তাই। মাত্র পাচ সাত মিনিটের মধ্যে সব বমি হয়ে গেল। বিকেলে এক টুকরো আপেল খেয়েছিল। সেটাও বেরিয়ে গেল। আমার মনটা

খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম এক সঙ্গে পুরো গ্লাস না খাইয়ে কয়েকবারে খাওয়ালে বমিটা রোধ করা যেতো।

এর আধঘণ্টা পরে শাফিন নিজ থেকেই পানি খেতে চাইলো। আমি একটু অবাক হলাম। গত কয়েকদিনে এই প্রথম সে কিছু খেতে চাইলো এবং প্রায় আধা গ্লাসের মতো পানি খেলো। গায়ে হাত দিয়ে মনে হলো, জ্বর একটু কম। সন্ধ্যার পরে মেপে দেখি জ্বর ৯৯ ডিগ্রি-তে নেমে এসেছে। টানা সাত দিন পর শাফিনের জ্বর নামলো। পরদিন জ্বর একদম ছেড়ে গেল। খাওয়া-দাওয়া ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে লাগলো।

কেউ ভাবতে পারেন, পানিপড়া খাওয়া আর সুস্থ হওয়া এটা নিশ্চয় কাকতালীয় ব্যাপার। পানি পড়ায় কি কাজ হয় জানি না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হুজুরের নিখাদ ভালোবাসার অশ্রুজল সেদিন বিধাতার অন্তরকে সিক্ত করেছে সন্দেহ নেই।

এখনো শাফিনকে সেই হুজুর আরবি পড়ায়। এখনো শাফিন আগের মতো হুজুরের সঙ্গে দুষ্টুমি করে। তবে এখন আর আমার স্ত্রী হুজুর বদলানোর কথা বলে না। হুজুর দুই সপ্তাহ না এলেও অভিযোগ করে না।

ঢাকা থেকে

বিশ্বাসঘাতক

আমি তাকে সোহেল বলে ডাকতাম। সে ছিল হিন্দু। কিন্তু ছোট থেকে তাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। সে সুবাদে সোহেল যখন-তখন আমাদের বাসায় আসতো, থাকতো আমরাও সোহেলদের বাসায় নিয়মিত যাওয়া-আসা করতাম।

সোহেল ঢাকায় চাকরি করতো। সেদিন ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি। সোহেল ঢাকা থেকে সরাসরি আমাদের বাসায় এসেছে এক সঙ্গে ভ্যালেন্টাইনস ডে পালন করবে বলে। আমিও ভীষণ খুশি হলাম অনেক দিন পর পুরনো বন্ধুর সঙ্গে ঘুরবো। সারাটা দিন আমরা খুব মজা করলাম সোহেল কোথায় কোনো মেয়েদের সঙ্গে কি করেছে না করেছে সব রকম গল্প আমার সঙ্গে করতো। কারণ আমি ছিলাম সোহেলের সবচেয়ে ভালো বন্ধু। সেদিন রাতে সোহেলকে আব্বু আম্মু থেকে যেতে বললেন। কেননা সোহেল ঢাকায় থাকে তাছাড়া অনেকদিন পর খুলনায় এসেছে, তাই আমিও বললাম, আজ রাত থেকে যাও, কাল সকালে বাসায় যেও।

সোহেল রাতে আমাদের বাসায় থেকে গেল।

রাতে আমরা সবাই মিলে অনেক গল্প করলাম। তারপর রাতের খাবার খেয়ে সবাই সবার রুমে ঘুমিয়ে পরলাম। হঠাৎ প্রচণ্ড ব্যথা পেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি সোহেল আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে আর হাত দিয়ে খুব জোরে জোরে বুকে চাপ দিচ্ছে। ঘুমের ঘোরে আমি কি করবো

সেটা বুঝতে পারছিলাম না। এদিকে সোহেলের হাত আরো বেপরোয়া হয়ে আমার পায়জামার ফিতা খুজে বেড়াচ্ছে।
সোহেলের গালে জোরে এক চড় বসিয়ে দিলাম। তারপর কিছুক্ষণ কাদলাম। এবং আম্মুকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললাম, আমার একা ঘুমাতে ভয় করছে, আমি তোমাদের সঙ্গে ঘুমাবো। বাকি রাতটুকু আম্মুদের সঙ্গে ঘুমালাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে শয়তানটা না খেয়েই চলে গেল। আমিও শয়তানটার সঙ্গে কোনো কথা বলিনি।
যাযাদির *ভালোবাসা* সংখ্যাটির দিকে চোখ পড়তেই পুরনো স্মৃতিটা মনে পড়ে গেল। আসলে ভালোবাসা সংখ্যায় ভালোবাসার গল্প লেখাই উচিত ছিল। কিন্তু এই ভালোবাসা দিবসে আমার সঙ্গে যা ঘটলো সে ঘটনাটি আজ পর্যন্ত কাউকে বলতে পারিনি। তাই আজ অনেক দিন পর যাযাদিকে আমার মনের কথাটি লিখে জানালাম।
আসলে ছেলেরা কখনো মেয়েদের বন্ধু হতে পারে না। ওরা শুধু মেয়েদের বন্ধুত্বের সুযোগে দেহ ভোগ করতে চায়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
খুলনা থেকে

লাভ ইন পাকিস্তান

– হাবিব খান

কামরানের সঙ্গে পরিচয় সিঙ্গাপুরে *পেনটা* হোটেলে। বাইশ বছর বয়সী সুদর্শন কামরান খান জন্মগ্রহণ করেন পাকিস্তানের পাঞ্জাবের কোনো এক গ্রামে। বেশ কিছুদিন দুজনে পাশাপাশি রুমে একই হোটেলে ছিলাম। ফলে তার সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়। পাকিস্তানের রাজনীতি, বাংলাদেশের রাজনীতি, বিশ্ব পরিস্থিতি, পাকিস্তানের কৃকেট, সঙ্গীত, আমার পরিবার, তার পরিবার বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়। আলোচনার এক পর্যায়ে আমি যখন বললাম, এখনো বিয়ে করিনি। তবে দেশে আমার গার্লফ্রেন্ড আছে এবং সে দীর্ঘ নয় বছর আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তারে আরো জানালাম, কিছুদিনের মধ্যেই দেশে ফিরে যাচ্ছি। খুব সম্ভবত আগামী ভ্যালেনটাইনস ডে-এর আগেই আমাদের বিয়ে হচ্ছে।
আমার কথা শুনে কামরান চুপ হয়ে গেল। খুব অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো।
খেয়াল করে দেখলাম সে কোনো কথা বলছে না। তার চোখ দুটো ছল ছল করছে। বুঝতে পারলাম যে কোনো কারণেই হোক তার মন খুব খারাপ হয়েছে। স্বাভাবিক হওয়ার জন্য তাকে কিছুটা সময় দিলাম। পরিস্থিতি বুঝে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে তোমার? মন খারাপ করলে কেন হঠাৎ?
কামরান এবার বলতে শুরু করলো। পাচ ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট সে। স্কুল পেরিয়ে সবেমাত্র কলেজে পা দিয়েছে। ঘরে সৎ মা আছে। সে যখন খুব ছোট তখন তার মা মারা যান। মায়ের কথা খুব একটা মনে নেই। সৎ মায়ের অনাদরে এবং বাবার অতি আদরে বড় হয়েছে সে। তার পরিবার

হলো এলাকার মধ্যে কয়েকটা ধনী ফ্যামিলির মধ্যে একটা। নাদিয়া আকতার হলো তার সৎ মায়ের বোনের মেয়ে। স্কুল পড়ুয়া নাদিয়া তাদের বাড়িতে প্রায়ই আসতো বেড়াতে। মনের অজান্তেই দুজনের মধ্যে মন দেয়া-নেয়া হয়। এক পর্যায়ে দুজন দুজনকে প্রচণ্ডভাবে ভালোবেসে ফেলে। ঘটনাটা কামরানের পরিবারে জানাজানি হয়ে যায়। কামরানের বাবা নাদিয়াকে ভুলে যেতে বলেন কামরানকে। কারণ তাদের সমাজে ভালোবাসা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং অনেকে এটাকে বড় ধরনের অপরাধ বলে মনে করে। ফলে ছেলের জীবন নিয়ে শংকিত হয়ে পড়েন কামরানের বাবা। এদিকে কামরানও বলে দেয় নাদিয়াকে না পেলে সে জীবন দিয়ে দেবে।

সর্বসম্মতিক্রমে একদিন কামরানের বাবা মা নাদিয়ার বাবা মায়ের কাছে যান তাদের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। নাদিয়ার বাবা মা ক্ষিপ্ত হয়ে যান। চরম দুর্ব্যবহার করে ফিরিয়ে দেন কামরানের বাবা মাকে। এদিকে তড়িঘড়ি করে নাদিয়ার বিয়ে ঠিক করে ফেলে নাদিয়ার পরিবার। নাদিয়ার এক চাচা পাকিস্তান আর্মিতে চাকরি করেন। মূলত এ লোকটিই নাদিয়ার বিয়ে অন্য জায়গায় দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। নাদিয়া কিছুতেই রাজি হচ্ছিলো না।

একদিন রাতে নাদিয়া তার ভাবীর সঙ্গে ঘুমিয়ে পরে। নাদিয়ার চাচা চরম নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। পেছনে লুকিয়ে মেশিন গান নিয়ে নাদিয়ার রুমে ঢুকে রুম থেকে ডেকে তোলেন। নাদিয়াকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি এনে দিতে বলেন।

নাদিয়া বুঝতে পারে তার ভয়াবহ পরিণতি আসন্ন। ভয়ে শিউরে ওঠে সে। অনেক আকুতি জানিয়ে চাচাকে বলে, চাচু, প্লিজ, আমাকে মেরো না। চাচু আমাকে বাচতে দাও। নাদিয়া ভয়ে তার ভাবীকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু তার কোনো কথাই শুনলেন না হায়েনারূপী এ মানুষটি। পেছন থেকে মেশিন গান বের করে ফায়ার করলেন নাদিয়াকে। নাদিয়া লুটিয়ে পরলো মেঝেতে। নরাধম, অমানুষ, বর্বর লোকটি কামরানের ভালোবাসাকে, কামরানের নাদিয়াকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে মেরে ফেললেন। নাদিয়ার জীবন প্রদীপ নিভে গেল।

নাদিয়ার নামাজে জানাযার পর তার বাবা মা সবার সামনে ঘোষণা করলো এ হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী কামরান খান। তারা এ হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করেন নাদিয়ার লাশ সামনে নিয়ে।

কামরানের জীবন এলোমেলো হয়ে যায়। জীবনের সব স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে যায়। ছেলের জীবন বাচাতে বাবা বিদেশ পাঠিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেন। প্রথম টার্গেট নেয় জাপান চলে যাবার। জাপান যাওয়ার পথে সিঙ্গাপুর ট্রানজিট থাকে কিছুদিন। ভালোবাসার মানুষকে হারিয়ে সে আজ পাগলপ্রায়। নিজের মৃত্যুর ভয়, নাদিয়া হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার সংকল্প নিয়ে আজ ঘুরে বেড়াচ্ছে সে এক দেশ থেকে আরেক দেশে।

কামরান খানের কথা শুনে নির্বাক হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছিল হিন্দি সিনেমার কোনো কাহিনী শুনছি। কামরান খানকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রমিজ করলাম আগামী ভালোবাসা দিবসে যায়ায়দিনে তার ভালোবাসার কথা লেখার। তার নাদিয়ার কথা লিখবো বলে। নাদিয়ার আত্মার মাগফেরাত আর কামরানের সুস্থ জীবন কামনা করে সব প্রেমিক প্রেমিকার কাছে দোয়া চাইবো প্রমিজ করলাম।

সে শুধু কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো আমার দিকে।

সিঙ্গাপুর থেকে

সন্ত্রাসী

দক্ষিণাঞ্চলের এক বেসরকারি ব্যাংকের সুন্দরী জুনিয়র অফিসারের সঙ্গে পরিচয় ঘটে গত ছয় মাস আগে। আস্তে আস্তে দুজনের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকলো। একদিন ফোনে তার প্রতি ভালোবাসার হাত প্রসারিত করে বললাম, তোমাকে ভালোবাসতে গিয়ে কাজকর্মে ভুল হয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে জানালো, আমারও একই অবস্থা।

সেই থেকে শুরু। বিশাল অবস্থা তাদের। আমার মতো বাবা ছাড়া সবই আছে তার। চাকরিটা নাকি নিতান্তই শখের বশে করছে সে।

ব্যবসা এবং টাকার পেছনে ছুটতে গিয়ে প্রেম, ভালোবাসায় আসলেই অনভিজ্ঞ আমি। এদিকে বিয়ের কথা বলে বলে বিরক্ত হয়ে মা ওসব কথা মুখেই আনেন না ইদানীং।

এক বিকেলে কথা নেই, বার্তা নেই হুট করে মোবাইল লাইনে বললো, এই, আমি দুইশ কিলোমিটার দূরে দামপাড়া সোহাগের কাউন্টারে, জলদি এসো।

ভড়কে গেলাম। বলে কি মেয়ে। ছুটে গিয়ে ভয়ে ভয়ে বাড়িতে নিয়ে গেলাম তাকে। মাকে আড়ালে নিয়ে বললাম, একজন ব্যাংক অফিসার, কাজকর্মে আমাকে ভীষণ হেলপ করেন।

এই অবস্থা? বলে মা হাসিমুখে তাকে বরণ করলেন।

প্রচণ্ড চঞ্চলা দুই ঘণ্টার মধ্যেই মা আর ছোট বোনকে ম্যানেজ করে ফেললো। হই চই করে সারা বাড়ি মাথায় নিল সে। মা কাছে টেনে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলেন তাকে।

খাবার টেবিলে মা আমাকে বললেন, এ রকম একটা চটপটে মেয়েই তোর জন্য বৌ করে আনবো আমি।

সবাইকে অবাক করে হঠাৎ মাকে বলে বসলো সে, সেকি, আপনার ছেলে কিছুই বলেনি আপনাকে? এতোদিন প্রেম করলো, বিয়ের কথা পাকা করতেই তো সে আমাকে আসতে বলেছে।

ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়লাম।

অবস্থা দেখে মা বললেন, মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়ে গেছে বাবা, আর দেরি নয়।

যাবার সময় জেদ ধরলো, আমিসহ ঢাকায় গিয়ে তাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিতে হবে।

মা অনেকটা মিনতি করে বললেন, মেয়েটা আসলেই সহজ-সরল। ভালোয় ভালো পৌছে দিবি। তার যেন কোনো ক্ষতি না হয়।

তথাস্তু।

ঢাকায় পৌছেই সে অসুস্থ হয়ে পড়লো। বাধ্য হয়েই একটা আবাসিক হোটেলে উঠলাম দুজনে। কিন্তু একি?

রুমে ঢুকেই সে মিষ্টি মুচকি হেসে বললো, তুমি আসলেই একটা বোকা, রসবোধ বলতে তোমার মধ্যে কিছুই নেই। কেমন ভালোবাসো আমাকে, একদিনে একটু ছুয়েও দেখলে না আমাকে?

এই প্রথম কাছে টানলাম তাকে। তার শরীরের গন্ধে বিমোহিত হয়ে পড়লাম। প্রচণ্ড আবেগে আকড়ে ধরলাম তাকে। সেও। হঠাৎ মায়ের কথা মনে করে থমকে দাড়ালাম। না, মায়ের কথা আমাকে রাখতেই হবে।

গল্প করেই মধ্যরাত। দুজন দুই খাটে এপাশ–ওপাশ করছি শুধু।

সে বললো, ঘুম আসছে না তোমার?

মাথাটা একটু ধরেছে...

আমার খাটে এসো মাথায় বিলি কেটে দিই।

না, ঠিক আছে।

ভদ্রতার খাতিরে বললাম, ঘুম না এলে আমার খাটে চলে এসো, গল্প করি।

সে রেগেমেগে বললো, সারা গায়ে ঘামের গন্ধ, নাম ফুটায় আতর আলী। তুমি বললেই টুক করে চলে যাবো তোমার খাটে। কি ভাবো আমাকে?

ব্যস। চুপসে গেলাম।

তারপর থেকে পৌছার সংবাদটাও সে আমাকে দিলো না। ফোনে হ্যা, হু ছাড়া তেমন আলাপও করতে চায় না। তার কাছে গিয়ে অফিসে ডেকে এনে বললাম, এসবের মানে কি?

তুমি আসলেই একটা আহাম্মক, তোমার ওই হ্যান্ডসাম চেহারা ধুয়ে কি জল খাবো আমি? ও রকম একটা রাত মিস করতে পারে শুধু কাপুরুষরাই।

দেখো, এসব দুই নাম্বারি কথাবার্তা।

কি? আমি দুই নাম্বারি? চান্স তো দিয়েছিলাম, টেস্ট করে দেখোনি কেন?

কল্পনাও করিনি কোনো সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ে এসব কথা বলতে পারে। বললাম, কেন ভালোবাসার অভিনয় করলে এতোদিন?

তোমাকে ভালো না বাসলে তোমার বাড়ি পর্যন্ত যেতাম না কোনোদিন।

তাহলে বিয়ের আগে... তর্কে না গিয়ে চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করলাম।

শোনো, আজ রাতে আমাদের বাড়িতে খাবে। অপেক্ষায় থাকবো আমি। সে বললো।

রাজি না হয়ে পারলাম না।

খাবার শেষে জেদ ধরলো রাতটা তাদের বাড়িতেই থাকতে হবে। তার প্রচণ্ড জেদের কথা মনে করে রাজি হয়ে গেলাম।

মধ্যরাতে দরজার টুকটক শব্দে খুলে দেখি সে! আমি কিছু বলার আগেই জাপটে ধরে বললো,

দুই নাম্বার কাকে বলেছিলে? তোমার মতো হাফ ডজন স্মার্ট ছেলে আমার পেছনে ঘুর ঘুর করছে।

ভাবলাম, এই মেয়ে নির্ঘাত দুই নাম্বারি। রেন্টে তো দুই নাম্বারি অনেক চালিয়েছি, ক্ষতি কি। এবার তো মাকে কথা দিইনি।

অতঃপর বিনা বাধায় যা হওয়ার তাই হলো। টেস্ট রিপোর্ট চমৎকার।

সব কিছুর শেষে চুমু খেয়ে দুঃখ প্রকাশ করলাম।

এভাবেই চলতে থাকলো দুজনের গোপন অভিসার। বিয়ের কথা বললেই বলে, বিয়ে কেন? হাত বাড়ালেই তো পাচ্ছো আমাকে?

আমি সব কিছুর বৈধতা চাই।
এভাবেই বেশ মজা...।
তাহলে আমি, আমার পরিবার তোমার অপছন্দ?
মোটেই না, আই রেসপেক্ট ইওর ফ্যামিলি।
কি চাও তুমি?
নিশ্চয়ই কোনো টাকা পয়সা নয়। চাই তোমার সঙ্গ, তোমার ভালোবাসা।
তাহলে বিয়ে করতে আপত্তি কেন?
জানি না।
এখন থেকে তোমাকে ছুয়ে দেখতেও রাজি নই আমি। বললাম।
পারবে না। কল করলেই তুমি আমার কাছে আসতে বাধ্য।
সত্যিই তাই।
একবার তার ডাকে সাড়া না দেয়ায় লঙ্কাকাণ্ড বাধালো সে যা আমার জন্য চরম ক্ষতিকর।
বর্তমানে মোবাইল চেঞ্জ করে পালিয়ে বেড়াচ্ছি তার কাছ থেকে।
জানি না এ কোন সন্ত্রাসীর কবলে পড়লাম।

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

শিশির ছোয়া

– এম.ইউ. অভি

১৯১৯৫ সাল। সবে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তাই খোলা আকাশে পাখিরা যেমন মুক্ত তেমনি আমিও মুক্ত। এই মন কি যেন চায়। তার ওপর উঠতি বয়স। এই বয়সে তো একটু আধটু প্রেম ভালোবাসা পেতে ইচ্ছে করবেই। এ জন্য আমার মনেও একান্ত কারো ভালোবাসা পেতে ইচ্ছে করে।
আমার বাড়ির চাচাতো বোন শিশির। সবে ক্লাস সেভেনে পড়ে। তার যৌবন আমার মনে শিহরণ জাগায়। তার কথা ভাবতে আমার মনে কেমন কেমন করে। তার সব কিছুই আমার ভালোলাগে। এই ভালোলাগা কখন যেন ভালোবাসার রূপ নিয়েছে জানি না। তার কথা-বার্তা, চাল-চলন, বুকের গঠন, তার হরিণী চোখের মায়াবী দৃষ্টি আমাকে আরো বিমোহিত করে তোলে। মনে মনে তাকে নিয়ে ভালোবাসার স্বর্গদ্বীপ রচনা করলাম। মনে মনে ভালোবাসলেই তো হবে না, মনের কথা তো মনের মানুষকে জানানো চাই।
এবার শুরু হলো প্রেমের অভিযান। তার সঙ্গে প্রেম করতে চাই এ কথাটা একটু একটু করে প্রকাশ করতে লাগলাম। কিন্তু মুখে কিছুই বলতে সাহস পাচ্ছি না।
একদিন শিশিরকে একা পেয়ে জাপটে ধরে চুমু খেলাম। সে ভেংচি কেটে আমার কাছ থেকে দৌড়ে পালালো।

বুঝলাম কাজ হবে। তাকে কাছে পাওয়ার জন্য মন সব সময় ছটফট করতো। তার মিষ্টি মুখ আমার চোখের পাতায় ভেসে বেড়ায়। এ এক অন্য অনুভূতি। কিন্তু এখনো তাকে আমার মনের কথা বলা হয়নি।

সে স্কুলে আসা–যাওয়ার সময় তাকে অনুসরণ করলাম। একদিন সে স্কুল থেকে আসার সময় তার হাতে একটা চিরকুট ধরিয়ে দিলাম। বললাম, উত্তর চাই।

এরপরেই প্রতীক্ষায় রইলাম কখন উত্তর দেবে। প্রতীক্ষা শেষ হয় না। আমিও আর উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম না।

তারপর একদিন ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম কোচিংয়ে ভর্তির জন্য। ঢাকায় ভাইয়ার বাসায় উঠলাম। সেখান থেকেই রীতিমতো ক্লাস করতে লাগলাম। প্রথম কয়েকদিন তাকে ফিল করতাম। আস্তে আস্তে তাকে মন থেকে তুলে নিলাম। এভাবে তিন মাস পার হয়ে গেল। রেজাল্ট ভালো হলো। কয়েকদিন ধরে বাড়ি যাওয়ার জন্য মনটা উদগ্রীব হয়ে রইলো।

অবশেষে একদিন বাড়িতে গেলাম। শিশিরকে একটু এড়িয়ে চললাম এবং নিশ্চুপ রইলাম। ভাবলাম আর এসবে জড়াবো না। এভাবে দুই দিন পার করে দিলাম। তৃতীয় দিন রাতে ওদের পাশের ঘর থেকে টিভি দেখে বের হলাম। তার পড়ার ঘরের পাশ দিয়ে আসার সময় সে আমাকে আস্তে করে ডাক দিল। আমি দাড়িয়ে পড়লাম। তারপর জানালার কাছে গেলাম।

আপনি আমার উপর রাগ করেছেন?

আমি নিশ্চুপ।

কি, কথা বলছেন না যে।

বললাম, কোন অধিকারে তোমার সঙ্গে রাগ করবো।

সে আমার হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিল। বললো, রাত এগারোটায় আসবেন, কথা আছে।

আমি চলে এলাম। আমার চিন্তা আরো প্রসারিত হলো। কিছুটা আনন্দ অনুভব করলাম। সমস্ত দ্বিধা–দ্বন্দ্ব ভুলে সঠিক সময়ে তাদের ঘরের কাছে হাজির হলাম। তার জানালায় আস্তে করে টোকা দিতেই খুলে গেল। বুঝলাম সে আমার প্রতীক্ষায় রয়েছে। জানালায় হাত বাড়িয়ে দিলাম।

সে আমার হাত ধরে চুমু দিল। বললো, আই লাভ ইউ অভিভাই।

বললাম, তোমার মুখের এই কথাটি শোনার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম। আজ আমার ভালোবাসার নতুন দিগন্ত উন্মোচন হলো। আই লাভ ইউ শিশির। আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি।

আমাকে ভুলে যাবে না তো অভি।

কখনো না।

আমার হাত তার বুকে চেপে ধরলো। আমি শিহরিত হলাম। এভাবে অনেকক্ষণ পার হলো। তারপর বিদায় নিয়ে চলে এলাম। ঘরে এসে শুয়ে শুয়ে তার চিন্তায় মগ্ন রইলাম। ধীরে ধীরে চোখের পাতা বুজে এলো।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সে বাদাম কেনার নাম করে দোকানের কাছে আগেই চলে এলো। পথেই তার সঙ্গে দেখা হলো।

আসি শিশির। তুমি ভালো থেকো।

তার নীরব চোখ আমাকে যেতে নিষেধ করলেও আমার হাতে বাদাম দিয়ে বললো, নিন বাদাম খান। আবার কবে আসবেন।

খুব শিগগিরই আসবো। আমার মন তোমার কাছেই পড়ে থাকবে।

আপনি এই কলেজে ভর্তি হয়ে যান। বাড়িতে থাকেন।

তার কথায় হাসলাম। বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

ঢাকায় এসে তার কথাই বেশি মনে পড়তে লাগলো। এভাবে কয়েকদিন পার হয়ে গেল। সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে কাজে মন দিলাম। তারপরও সব সময় তাকে অনুভব করতাম। এরপর ভর্তি পরীক্ষা শুরু হলো। যে কোনো কারণেই হোক ঢাকায় ভর্তি হলাম না। বাড়িতে গিয়ে সেখানে ভর্তি হলাম। সে মনে মনে খুশি হয়েছে বুঝতে পারলাম। দুদিন পর আবার ঢাকায় চলে এলাম। বিকম ফার্স্ট ইয়ারে ক্লাস করলাম না। ঢাকায়ই কাটিয়ে দিলাম।

এদিকে শিশিরের তাড়া! আমি বাড়িতে থাকতে পারি না, যদি না আসি তাহলে আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। অবশেষে একদিন সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে বাড়ির ছেলে বাড়িতেই চলে এলাম। বাড়ি থেকেই ক্লাস করতে লাগলাম। এবং আমার প্রেয়সীকে চোখের নজরেই রাখতে পারছি। সবার অগোচরে আমার প্রেম চলতে লাগলো। এভাবেই প্রেম সাধনা চলতে লাগলো। তবে আমাদের প্রেমের সহকারী হিসেবে নিয়োজিত ছিল চাচাতো বোন আয়শা। তার মাধ্যমেই আমাদের যোগাযোগ চলতো।

তবে শিশিরের সঙ্গে দিনে কথা বলার সুযোগ থাকলেও বেশি বলতাম না। কারণ কেউ যদি জেনে যায় বা দেখে ফেলে সেই ভয় সব সময় কাজ করতো। তবে প্রেম কখনো লুকানো যায় না। এটা প্রকাশ পাবেই। বুঝতে পারছি আমাদের ব্যাপারটা অনেকেই জেনেছে। মুখে কেউ কিছু বলতে পারছে না।

ভয় পেলে কি আর প্রেম চলে! আমাদের প্রেম আপন গতিতে এগিয়ে চললো। শিশিরের সঙ্গে আমার প্রেমের অভিসার চলতো রাতে সবার অগোচরে। শিশির ওর দাদির ঘরে দাদির সঙ্গে ঘুমাতো। সব সময় আমি তার জানালায় চলে যেতাম। আমাদের মনের সকল কর্তাবার্তা লেন-দেন রাতেই চলতো। ওর হাতে হাত রেখে কাছে টেনে তার গালে চুমু খেতাম। আমাদের ভালোবাসার স্বপ্নের জাল বুনতে লাগলাম। তার ভালোবাসা আমাকে প্রেরণা দিতো।

সময় পেরিয়ে যায়। আমরা গলা জাপটে উড়ে বেড়াই একে অপরের কাধে ভর দিয়ে। তার দেখা একদিন না পেলে আমার কিছুই ভালো লাগে না। ঠিক তারিখ মনে নেই। রাত এগারোটায় কথা অনুযায়ী তার জানালায় হাজির হই। সে জানালা খুলে দেয়। আমি তার হাত ধরি সে আমার হাত নিয়ে আলতো করে চুমু দেয়।

আমার হাত তার মুখ থেকে শুরু করে গলায়, বুকে, তারপর নরম মাংসপিণ্ড পিষতে থাকে। এ এক অজানা শিহরণ! যেন পৃথিবীর স্বর্গ সুখ এখানেই। তার গরম নিঃশ্বাস আমাকে পাগল করে তোলে।

সে কানের কাছে আস্তে আস্তে বলে, অভি, কি করছো?

তার নরম ঠোট মুখে নিয়ে চুষতে থাকি।

এভাবে কতোক্ষণ যে গভীর রাত হয়ে গেছে জানি না। শিশিরকে বিদায় জানিয়ে চলে আসি। তখন রঙিন স্বপ্নে বিভোর ছিলাম। পৃথিবীটাকে আরো সুন্দর মনে হতো।

কথায় আছে, কপালে সুখ বেশি দিন টেকে না। তাই আমাদের প্রেমেও কিছুটা ভাটা পড়লো। মান–অভিমান চলতে থাকে। আবার সব অভিমান ভুলে নতুন উদ্যোমে ভালোবাসার স্বর্গ রচনা করতাম।

আমার ডিগ্রি পরীক্ষা চলছে। বুঝতে পারলাম, আমার কাছ থেকে সে একটু একটু দূরে সরে যাচ্ছে। এবং জানতে পারলাম, আমার মন পাখি অন্য কারো প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। ছেলেটি আমার চেয়ে অনেক জুনিয়র। নিজেকে খুব অপমানিত বোধ করলাম। ভাবতে লাগলাম আমার মধ্যে কি এমন অভাব রয়েছে যে জন্য অন্য আরেকটি ছেলের ভালোবাসার প্রয়োজন। ঘটনাটি যে সত্যি তার প্রমাণ পেয়েছি। এই টেনশনে পরীক্ষা কিছুটা খারাপ হলো।

অবশেষে রাতে তার পড়ার ঘরে যাই। সে আমার চেহারা দেখে কিছুটা অবাক হয়ে যায়। আমি ভূমিকা না রেখে সরাসরি প্রশ্ন করলাম, আসলেই কি তুমি আমাকে ভালোবাসো?

কেন বলুন তো?

যা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর দাও।

ভালোবাসি তো।

সত্যিই ভালোবাসো?

কি বলছেন?

তুমি তো অন্য কাউকে ভালোবাসো।

কে বলেছে আপনাকে?

যা সত্যি তাই বলছি।

সত্যি করে বলছি, তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসি না। এই বই ছুয়ে বলছি।

তার মিথ্যা কথা শুনে আমার মাথায় আগুন জ্বলে। তার চুল ধরে গালে চড় বসিয়ে দিলাম। আমার এই আকস্মিক আক্রমণে সে কিছুটা বিচলিত হয়ে যায়। সব কিছুই যে এতো দ্রুত ঘটবে সে এতোটা আশা করেনি। তার চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগলো।

আমি কিছুটা নরম হয়ে বললাম, তুমি যা করছো তার পরিণাম ভালো নয়। তুমি ভুল করছো। তুমি ভুল পথে যাচ্ছো।

সে মাথা নিচু করে রইলো। তোমার এ ভুল ভাঙবেই। তখন বড্ড দেরি হয়ে যাবে। বললাম, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ শেষ হয়ে গেল। বলে আমি চলে আসি।

পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ঢাকায় চলে আসি। আর কোনো যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করিনি। বাড়িতে এলেও তার সঙ্গে কথা বলি না। দীর্ঘ এক বছর তার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ রাখি। এরই মধ্যে নাটকীয়ভাবে অনেক কিছুই ঘটে যায় তার জীবনে। তা আর নাই বা বললাম।

অবশেষে সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটে। তার সঙ্গে বিশেষ কারণে কথাবার্তা হয়। তার আন্তরিকতার কারণে তার প্রতি কিছুটা দুর্বল অনুভব করি। আমি ভুল করছি কি না জানি না। যেভাবেই হোক দীর্ঘ দিনের বিরহ কাটিয়ে নতুন করে আবার প্রেম জোড়া লাগে। সব দ্বিধা ভুলে যাই। সময়ের তালে তালে আমাদের প্রেমও এগিয়ে চলে। এমনি করে বসন্ত যায়, বসন্ত আসে। পুরনো পথে নতুন করে

পদার্পণ। হাতে হাত রেখে মায়াবী সুখের আবেশ ছড়িয়ে প্রেমকে সার্থক করার প্রয়াস, নতুন স্বপ্নের জাল বোনা। একই সঙ্গে পথ চলায় দুজনার দৃঢ় সংকল্প।

২০০২ সালের জানুয়ারিতে শিশির ঢাকায় তার বোনের বাসায় আসে। জানুয়ারির ৮ তারিখে আমি এক চাচাতো ভাইসহ তাদের বাসায় যাই। সে আমাদের দেখে খুব খুশি হয়। আমরা অনেক সময় আনন্দে কাটাই। এবং ১২ তারিখে *বাণিজ্য মেলা*-য় নিয়ে যাবো বলে চলে আসি।

নির্ধারিত দিনে আমরা তাদের বাসায় যাই। মেলার উদ্দেশ্যে রওনা দিই। প্রথমে আমরা সংসদ ভবনে ঘুরি হাতে হাত রেখে। সেখানে অনেক ছবি তুলি। তারপর মেলাতে যাই। মেলাতে আমরা খুব এনজয় করি, সঙ্গে চাচাতো ভাই ছিল। সেখানেও অনেক ছবি তুলি। রাত আটটার দিকে বাসায় ফিরে যাই। এভাবে কয়েকদিন পর ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন ডে-তে তাদের বাসায় হঠাৎ করে যাই। সে অবাক হয়ে যায়। তাকে ভ্যালেন্টাইনস উইশ করি।

সেদিন তার বোন বাসায় ছিল না। তার হাত ধরে খুব কাছে টেনে নিই।

সে বলে, এই কেউ দেখে ফেলবে তো।

দেখুক না কি হয়েছে। চলো না আমরা বিয়ে করে ফেলি।

সে বলে, বিয়ে করার খুব শখ, তোমাকে কাছে না দেখলে আমার ভালো লাগে না।

এভাবে অনেক সময় চলে যায়। আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি।

এমনি করে আমাদের প্রেম প্রদীপ জ্বলতে লাগলো।

ভালোবাসা মানুষকে পূর্ণ করে আবার নিঃস্ব করে দেয়। আমার জন্য যে চরম দুঃসময় অপেক্ষা করছে তা জানা ছিল না। গত সেপ্টেম্বরের ৫ তারিখে বাড়িতে যাই। বাড়িতে যাওয়ার পর জানতে পারলাম আমার প্রাণ পাখি কয়েকদিন আগে লাল বেনারসি জড়িয়ে অন্যের ঘরে চলে গেছে। ছেলে নাকি বিদেশ ফেরত, খুব পয়সাওয়ালা। তাই আর দেরি করতে পারলেন না। সোজা বিয়ে।

সে এখন অন্যের ঘরের ঘরণী। অন্যের বুকে মাথা রেখে নতুন স্বপ্নের জাল বোনে। সে এখন আরেকজনের শয্যাসঙ্গী। আমার চেনা পথ ধরে সে আরেকজনকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এতো সহজেই সে সব কিছু ভুলে গেল! ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই। এতোদিনের সব কিছুই কি মিথ্যা? আমার ঘুম নষ্ট করে সে আরেকজনের বুকে গভীর নিদ্রা যায়।

তাকে ভুলতে পারছি না, ভোলা যায় না। তবুও মেনে নিয়েছি সব বাস্তবতাকে। ডেল কার্নেগির ভাষায় - *পৃথিবীতে ভালোবাসার একটি মাত্র উপায় আছে... সে হলো প্রতিদান পাওয়ার আশা না করে ভালোবেসে যাওয়া।* আমার ভালোবাসাও ঠিক তেমনটি।

আসলে শিশির নামটি আমার জীবনে ক্ষণস্থায়ী হয়ে এসেছে। শিশির কণা যেমন সূর্যের আলোতে উবে যায় ঠিক তেমনি আমার জীবন থেকে শিশির নামের মেয়েটি উবে গেছে।

আজো ঘাসের ওপর দিয়ে হাটার সময় শিশির কণাগুলো বার বার শিশির নামটি বুকের মাঝে ধ্বনিত হয়। থমকে যাই আর বুক থেকে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস।

ইব্রাহিমপুর, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে

সাফ কথা

– হেলাল

বন্ধু দেলোয়ার সাফ কথা বলার ওস্তাদ।

সাফ কথা মানে *সারকথা।*

বন্ধুদের মধ্যে যে কোনো বিষয়ে আলোচনা শুরু হলে সে তার সাফ কথা না শুনিয়ে ছাড়ে না।

তার সাফ কথা না শুনলেও আমাদের ভালো লাগে না।

ক্লাস শেষে আমাদের সে আড্ডা বসে, অধিকাংশ দিন এই আড্ডার বিষয়বস্তু থাকে, প্রেম ভালোবাসা। কে, কার পেছনে ঘুরছে কিংবা কার প্রেম কি পর্যায়ে আছে।

সেদিনের আলোচনাটা ছিল একটু ব্যতিক্রমধর্মী। প্রেম ভালোবাসার মূল লক্ষ্য কি এই নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক চলছে। প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ যুক্তিকে দাড় করানোর জন্য মরিয়া প্রায়। কে কার যুক্তিকে খণ্ডন করবে এই নিয়ে একটা মল্ল যুদ্ধের মতো অবস্থা। সেদিনের আলোচনায় দেলোয়ার উপস্থিত না থাকলে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেতো। দেলোয়ারের ওই একটি বাক্য পুরো পরিস্থিতিকে পাল্টে দিল। এরই নাম মনে হয় *সাফ কথা।*

কোনো রকম ভনিতা ছাড়াই দেলোয়ার বললো, প্রেমিকার গোপন অঙ্গ ও প্রেমিকের গোপন অঙ্গ দৈর্ঘ ভেদে মাইনাস সর্বাধিক দূরত্বে পৌছানোই প্রেম ভালোবাসার মূল লক্ষ্য।

এ কথা সোনার পর সবার যুক্তি শুয়ে পড়লো।

সবাই হুর রে! ধ্বনি তুলে আলোচনা সভার ইতি টানলো। কেননা টিফিন শেষের ঘণ্টা টুং টুং করে বেজে উঠেছে।

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ থেকে

জাপানিজ অনুরাগ

– সৈয়দা ফাতিমা হেনা

দিনটি ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি। ভ্যালেনটাইনস ডে বা ভালোবাসার দিন। জাপানে ব্যাপকভাবে এই দিনটি উপভোগ করে তরুণ–তরুণীরা। এর মধ্যে তরুণীরা দিনটি তাদেরই ভাবে। তারা তাদের ভালোবাসার মানুষটিকে শ্রেণী ভেদে সম্পর্ক অনুযায়ী চকলেট, কেক, ক্যান্ডি উপহার দিয়ে থাকে। দোকানে দোকানে হৃদয় অংকিত চকলেট–চিনির ধাচে রঙিন সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের ফুল ও ভালোবাসার মনোগ্রামের পসরা সাজানো থাকে।

এদিন তরুণীরাই এগুলো কেনে বেশি। এর এক মাস পর ছেলেরা এই উপহারের প্রতিদান দিয়ে থাকে। দেয়া–নেয়ার এই রীতিটি বাংলাদেশে এখনো শুরু হয়নি। ধন্যবাদ যায়যায়দিনকে অন্তত ভালোবাসার দিনটি তো তারা শুরু করতে পেরেছে। বাকি দরজা আস্তে আস্তে খুলে যাবে। উপহার দেয়া– নেয়ার রীতিটি যাযাদি ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে শুরু করতে পারে। তরুণ–তরুণীদের বিনোদন বা মানসিক আনন্দের খুব অভাব এ দেশে। ছোট ছোট আনন্দ সমাজকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে পারে।

এমনি একটি ১৪ ফেব্রুয়ারিতে আমার জীবনে শুরু হয়েছিল আর একটি ভ্যালেনটাইনস ডে। যার পোড়া ঘায়ের যন্ত্রণা প্রতি ভালোবাসার দিনেই অনুভব করি একটি যুবককে। আশা করি একটি চিঠি অথবা ফোনের।

পাচটি বৃহৎ দ্বীপ নিয়ে দেশ নিপ্পন। সীমাকুনির দেশ। চারদিকেই সমুদ্র, তার মাঝখানে স্বপ্নের দেশ জাপান, (নিহন–নিপ্পন)। এক সময় সমাজ ব্যবস্থাটা ছোট ছোট গোত্রে বিভক্ত ছিল। গোত্র নেতার প্রতি ছিল একনিষ্ঠ আনুগত্য। অন্ধ দেশপ্রেম, কঠোর জাতীয়তাবোধ এবং পরিশ্রম যা তাদের আজকের এই অবস্থায় এনেছে।

টোকিও–র জনপ্রিয় ব্যস্ত বড় একটি রেল স্টেশন ইকেবুকুরু থেকে ফিরছিলাম সাইতামা পৃফেকচারে (Ken–কেন)। টিকেট চেক করে দিলাম দৌড় এক্সপ্রেস ট্রেনের দিকে এক নাম্বার প্ল্যাটফর্মে। সরাসরি সাইতামার সিকি স্টেশনে থামবে। সেখান থেকে লোকাল হয়ে যাবে। আমি থাকি সিকির এক স্টেশন পরেই মিজুহুদাই–তে। এক্সপ্রেস ট্রেনগুলোতে প্রচণ্ড ভিড় থাকে। কখনো কখনো কোনোক্রমেই দরজা বন্ধ হতে চায় না। লাইনম্যানরা ধাক্কা–ধাক্কি করে যাত্রীদের ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করে।

কোনো মতো ঢুকতে পারলাম। এরপর নিজেকে আবিষ্কার করলাম অপর কামরার মাঝের দরজার কাছে একটি যুবকের বুকের মধ্যে লেপ্টে আছি। দৃশ্যটি দ্রুতগামী ট্রেনগুলোতে খুবই সাধারণ। একটি বিদেশিনীকে দেখে যুবকটি অসহায়ভাবে শক্ত হয়ে দাড়িয়ে রইলো। বাংলাদেশে বসে দৃশ্যটি ভাবা কঠিন। এখানে এমন অবস্থায় সকলেই প্রায় নারী দেহের নোনা গন্ধ পেতে চেষ্টা করে। ট্রেন সিকি থামতেই ফাকা হয়ে গেল। সিড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে চোখাচোখি হলো। তীব্র শীতের মধ্যেও কেমন একটা উষ্ণতা অনুভব করলাম।

ফেব্রুয়ারিতে প্রচণ্ড শীত। সাইতামাতে প্রায়ই বরফ পড়ে। সঙ্গে বৃষ্টিও পড়ে। কয়েকদিন ছুটি ছিল। বিকেলে কিছু কেনাকাটার জন্য স্টেশনের কাছে ডিপার্টমেন্টাল চেইন স্টোর BIG-A–তে গেলাম। ট্রলিটা ঠেলে থরে থরে সাজানো ফলের ঝুড়িগুলো দেখছিলাম। মজার ফল *খাকি।* দেখতে গাঢ় হলুদ রংয়ের। প্রচণ্ড মিষ্টি। ভেতরে ছবেদানা ফলের মতো বিচি আছে। স্বাদে তুলনাহীন।

নিহনো খুদামনো ইসকি দেস কা? – জাপানি ফল কি তুমি পছন্দ করো।

চমকে উঠলাম। ট্রেনের ভেতর দেখা সেই তৃপ্ত বুকের পুরুষ। হাসলাম।

দাই ইসকি দেস – খুব পছন্দ করি। কিছু বোঝার আগেই এক ঝুড়ি ফল কিনে আমার ট্রলিতে দিয়ে বললো, বন্ধু হিসেবে উপহার। খুবই সাধারণ ফল। জাপানি মেয়েরা খুব পছন্দ করে।

টুকটাক কথা বলতে বলতে ফিরলাম একই সঙ্গে। পথে নিজস্ব পয়সায় দুজনে কফি খেলাম।

এরপর ঘটনা কেমন যেন দ্রুতই ঘটে যেতে লাগলো। কেমন করে ট্রেন, বাসে প্রায়ই দেখা হতে থাকলো। আর আমার ভাবনাগুলো এলোমেলো হওয়ার আগেই তাকে যেন আমার চোখের তারায় তারায় দেখতে থাকলাম। ছুটির দিন কখনোই আমার থাকে না, একাকিত্ব বোধ করি না। দুজনেই টোকিও সাইতামার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়াই। ইয়োকোহামা সিটির (বন্দর নগরী) সি প্যারাডাইসে গেলাম। অপরূপ বিনোদন পার্ক। তীর থেকে অনেকখানি দূরে সমুদ্রের ভেতর তৈরি করা।

নবোরু (ছেলেটির নাম)–কে আজকে একটু চপল, একটু রোমান্টিক মনে হলো। আমার দেশ, সমাজ, সামাজিক আচার–আচরণ সম্পর্কে জানতে চাইলো। হেসে বললো, বাঙালি না হতে পারি, বাংলাদেশি তো হতে পারি। ইতিমধ্যে কিছু বাংলাও শিখেছে।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। সমুদ্রে ছোট–বড় নানান নৌকা জাহাজ থেমে আছে। তার মাঝে দুরন্ত বেগে ছুটে যাচ্ছে স্পিডবোট নিয়ে একদল তরুণ যৌবনের গান গেয়ে। যৌবনের সাহসই আলাদা।

তাড়া দিলাম, ফিরতে হবে। ততোক্ষণে কুয়াশায় ঢেকে গেছে সি প্যারাডাইসের ঝলমলে আঙ্গিনা। কথা ছিল পরদিন দেশে যাবো। নবোরু অনুরোধ করলো তাড়াতাড়ি জাপানে ফিরে আসতে। বেশি দিন বন্ধু হয়ে থাকতে চায় না। জীবনটা স্বপ্নময় করতে চায়। তীব্র আবেগে ভরপুর ছিল সে। কিন্তু কণ্ঠস্বর ছিল একজন যুবতীর সামনে মোলায়েম আর মিনতিতে ভরা।

অনেক দিন দেশে কাটিয়ে আবার ফেব্রুয়ারিতে ফিরে গেলাম জাপানে। ইতিমধ্যে প্রচুর চিঠি আর ফোন পেয়েছি। ফিরে যাবার তীব্র অনুনয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি ছিল ভ্যালেনটাইনস ডে। ওকে সুন্দর দেখে একটা টাই উপহার দিলাম। সারাদিন ভালোবাসায় আপ্লুত একটি মানুষ ট্রেন, বাস, পাহাড়, প্রান্তর, সিনজুকু গোয়েন পার্কে আমাকে ঘিরে রইলো। উপহারে আমার দুই হাত শুধুই নয়, মনের ঝুড়িটাও ভরে গিয়েছিল।

এর দুই একদিন এর মধ্যেই শুনেছি একাকিত্বের দুঃসংবাদ। নবোরু B.M.W কম্পানিতে চাকরি পেয়ে জার্মানি–তে যাচ্ছে। ছয় মাসের আগে ছুটি পাবে না। চলে যাবার আগে তার পরিবারের সঙ্গে (শুধু মা) আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

বিদায় বেলায় নারিতা এয়ারপোর্টে নবোরু আর তার মায়ের সঙ্গে আমিও কেদেছিলাম। স্বদেশি–বিদেশি নয়, আমাদের সবার চোখের পানিই ছিল নোনা। যাবার আগে আড়ালে ডেকে নবোরু আমাকে দিয়েছিল ছোট একটি উপহার। যা ছিল আমার আর তার একান্তই নিজস্ব। নবোরু–র অভাবে কয়েকটা দিন বন্ধুহীনতার একাকিত্বে ঝর ঝর করে কেদেছি।

কিন্তু আমার একাকিত্বকে সে দূরে থেকে ভরিয়ে দিয়েছে ফোন, মেসেজ আর জার্মানি–র সুন্দর সুন্দর ভিউ কার্ড দিয়ে। মাঝে মধ্যে দিয়েছে ভবিষ্যতের জাল বোনা গভীর আবেগে সিক্ত চিঠি। প্রায়ই লিখতো, জার্মানি–তে শরীর, মন কিছুই ভালো যাচ্ছে না। ফিরে আসার কথা ভাবছে। আমিও বার বার অনুরোধ করেছি চলে এসো।

হঠাৎ একদিন নবোরুর মায়ের ফোন পেলাম। জানালেন তিনি জার্মানি যাচ্ছেন। ছেলের শরীর ভালো না। সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। কিন্তু আসেননি। মায়ের ফোন পেলাম উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে আমেরিকায় নিয়ে যাচ্ছেন। সে ক্যান্সারে আক্রান্ত। তার বাবাও এ রোগেই অল্প বয়সে মারা গিয়েছেন। মায়ের অনুরোধ, তার ছেলের জন্য যেন আমার মতো করে প্রার্থনা করি।

দুঃস্বপ্নগুলো প্রতিদিনই ঘিরে থাকতো। আস্তে আস্তে যোগাযোগ কমে গেল। নবোরু এবং তার মা আর ফোন করেন না, চিঠিও দেন না। তাদের বাসায় গিয়ে খোজ নিলাম। শুনলাম জার্মানি যাবার আগে মহিলা বাসা ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন।

এর দীর্ঘ দিন পর নবোরুর শেষ চিঠি পেয়েছি। সেই ভ্যালেনটাইনস ডে–তে আমেরিকা থেকে। প্রতি ছত্রে তীব্র ভালোবাসায় পূর্ণ। চিঠিতে নবোরু কখনো জীবন্ত হয়ে হেসেছে, কেদেছে, রোগের যন্ত্রণার

কথা লিখেছে আবার ভালোবাসায় রাঙিয়ে অনুনয় করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে সকল অক্ষমতার। চিঠির আবেগে কান্না ক্লান্তিতে, অবসাদে যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছি।
নবোরুর শেষ আমি জানি না। তার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি।

গৃন রোড, ঢাকা থেকে

গোল্ডেন জুবিলির পর

– এ.এন. ওয়াহিদ

আমার এ পয়ষট্টি বছরের জীবনটা হয়তো বা ঘুণে ধরেছে। আমার ভালোবাসার পাত্রীটি তো তাই বলে। সে বলে, তুমি দিন দিন এতো শুকিয়ে যাচ্ছো কেন?
আমি বলি, এখন তো শুকানোরই সময়। একই ব্যাটারি আর কতো দিনই বা চলে।
তবু আমরা ভালোবাসার দম্পতি হিসেবে প্রায় পঞ্চাশ বছর কাটিয়ে এবার উপরে যাচ্ছি। গোল্ডেন জুবিলি পালন হয়ে গেছে।
আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুই মেরুর বাসিন্দা হয়েও অ্যাডজাস্ট ভালোই করে গেলাম। যেমন আমার গরম লাগে না।
এই ঢাকা শহরে শত লোড শেডিংয়েও দিব্বি আরামসে নাক ডেকে ঘুমাতে পারি। অপরদিকে আমার বেগম সাহেবা গরম সহ্য করতে মোটেই পারেন না। আমি এক ভাত, এক তরকারি পছন্দ করি, আর সে কি না বলে, তিন চারটা না হলে ভাত খেয়ে পেটই ভরে না। আমার রাগ নেই। তার রাগ কোনো কোনো সময়ে চরমে ওঠে।
এ দুনিয়ার সুখী দম্পতির সংখ্যাই বেশি। সুখী দম্পতিরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসুখী হলেও তা প্রকাশ করে না। যখন দুজনাই রাগী বেশি তখন কুরুক্ষেত্র তো হবেই। বয়সের তফাতও অনেক সময় বিয়ে বিচ্ছেদের কারণ হয়ে ওঠে। আমার গিন্নী তো মাঝে মধ্যে বলে ওঠে, তোমার মতো এমন লোক খুব কম মেলে। কারণ তুমি নিজের বুঝটা বোঝো না। তুমি হলে *একতাড়িয়া* পাখির মতো যারা নিজের চেয়ে পরের উপকার বেশি করে।
হ্যা ভাই, আমি তাই বটে। স্কাউট ছিলাম। তার ব্রত ঠিক রেখেছি। দেশ আগে, আমি পরে। তা না হলে কি কেউ এতো ছুটি পাওনা নিয়ে অবসর নেয়।
বেগম সাহেবা আফসোস করে বলে, তুমি চল্লিশ বছর চাকরি জীবনে এক বছরও সিএল পুরো করোনি। ছুটির দিনেও কাজ করেছো, অথচ একটা দোতলা বাড়ি তৈরি করতে পারলে না। ধিক তোমাকে।
সে ধিক বা ছিঃ! মাথা পেতে নিই। গিন্নী যখন রাগে গর গর করে তখন ভেজা বিড়ালের মতো চুপ করে থাকি। আমার ভালোবাসার সংসারের নায়িকার আছে অনেক গুণ। সে আমাকে গত একান্ন বছর যাবৎ যে সেবা করেছে তার তুলনায় কিছুই করিনি একমাত্র বিয়েবার্ষিকীতে একটা করে দেশি শাড়ি উপহার দেয়া ছাড়া।

সে আমাকে এক এক করে আটটি সন্তান দিয়েছে। শুধু মেয়ে নয়, ছেলেও কোনো সিজারিয়ান ছাড়াই। প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে অন্তত এক বছর বুকের দুধ খাইয়েছে। তার রান্নার তারিফ বা প্রশংসা শুধু আমি নয়, সবাই করে যারা তার রান্না খেয়েছেন। ষাট ছুই ছুই বয়সেও সে আমাদেরকে নিজ হাতে রান্না করে দিচ্ছে। তার কাছে আমি ও আমার ছেলেমেয়েসহ সবাই খুশি।

গত বিয়েবার্ষিকীতে সে নিজে পোলাও, রোস্ট তৈরি করে আত্মীয়স্বজনদের আপ্যায়ন করেছে। অবশ্য আমিও দুই একটা ভ্যালেন্টাইনস মেনু তৈরি করেছিলাম। আমাদের অবসরপ্রাপ্তদের সমিতির অফিসের অনেককেই তা খাওয়ানো হয়েছে। এমনকি নিউ ইয়র্কেও বন্ধুবান্ধবদেরকে এনটারটেইন করা হয়েছে। *স্বজন সমাবেশ*–এর বন্ধুরা, *বন্ধু সভা*–র বন্ধুরা ও *পাঠক ফোরাম*–এর বন্ধুরা যারা আমাকে ভ্যালেন্টাইনস নানা, ভ্যালেন্টাইনস আংকল কিংবা বুড়ো নানা বলে ডাকেন তাদেরকে আমন্ত্রণ রইলো আমার নিজ হাতের রান্না করা ভ্যালেন্টাইনস খাওয়াগুলো টেস্ট করতে।

কখন কোথায় তা পাওয়া যাবে সেটা তার কাছেই জেনে নিন।

ঝিগাতলা, ঢাকা থেকে

অপরিবর্তিত

– রুনি

ভালোবাসার রূপ যে যুগের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় তা নিশ্চয়ই অনেকেই বিশ্বাস করেন না। আমিও করি না। আমার কাছে ভালোবাসার কোনো বিপরীত শব্দ নেই। ভালোবাসাকে কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। আমার কাছে প্রেম এবং ভালোবাসার মধ্যে ভালোবাসার স্থান সর্বাগ্রে। যদি কাউকে ভালোবাসা যায় তাহলে হাজার বাধায়ও তা নষ্ট হয়ে যায় না।

আমার আর অনির সম্পর্ক ছিল চার বছর। অবশ্য এর মধ্যে অনেক ভাঙা–গড়ার সময়ও ছিল। শেষ পর্যন্ত আমাদের সম্পর্ক টিকলো না। কারণ ওই একটা জায়গায় ওর যুক্তির সঙ্গে আমার যুক্তির কোনো মিল ছিল না। তা হলো শরীর। আমার যুক্তি সম্পূর্ণ এর বিপক্ষে ছিল।

আজকাল যে শরীর সম্পর্কীয় প্রেমের বুলি আওড়ানো হয় তাতে সত্যিকারের ভালোবাসা আদৌ আছে কি না তাতে সন্দেহ। অনির কথায়, আমি নাকি সেকেলে।

যাহোক, তারপরও তাকে ভালোবাসি। কারণ তার জন্য আমার ভালোবাসা ছিল। কোনো মোহ ছিল না। আমি তাকে প্রচণ্ড রকমভাবে ভালোবাসি। এবং তাকে বলতে ইচ্ছে করে, ভালোবাসার কোনো পরিবর্তন নেই। এটি First law of thermodynamics-এর মতো সত্য।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, চট্টগ্রাম থেকে

হঠাৎ বৃষ্টি

– নজরুল ইসলাম বাবু

প্রেম–দিওয়ানালাইসিস রোগে আক্রান্ত আমার তালবেতাল কর্মকাণ্ড আন্দাজ করতে পেরে প্রেম বিশেষজ্ঞ বন্ধুরা সবাই মিলে বসলো জারুল তলায়। উদ্দেশ্য আমার গুষ্ঠি উদ্ধার।

ইসমাইলের বক্তব্য শুরু হলো, দেখ দোস্ত, হাড়কিপটেদের জন্য প্রেম নয়। প্রেম হলো টাকার সরোবরে ভাসমান পদ্ম।

সে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল সুজাত মোহাম্মদভাই বলে খ্যাত আনোয়ার উল্যাহ তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, প্রেম যদি করতেই চাস, মানিব্যাগের স্বাস্থ্যটা আগে ভালো কর। খরচ করার অভ্যাস গড়ে তোল। পরবর্তী কথা হলো চেহারার যা অবস্থা তা আর বলতে চাই না। তবে তোকে দেখলে মনে হয় ডারউইন সত্যি কথাটাই বলেছিলেন। সুতরাং প্রেমের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে গালে চড়, থাপ্পড় কিংবা হাই হিলের বাড়ি ইত্যাদি সহ্য করার অসীম ক্ষমতা থাকতে হবে।

তানিম বলে উঠলো, ও শালা তো মেয়েদের সামনে দাড়াতেই পারে না। তার আবার প্রেমের শখ?

এ ব্যাপারে ইসমাইলের সুপরামর্শ হলো, লিভিং ডল ব্যবহার করা। এতে নাকি সাহস বাড়ে। মেয়েদেরকে মেয়ে বলে মনে হয় না।

বাকি কথাটা বললো, রাসেল। তার বক্তব্য হলো, চেহারা থেকে গাধা গাধা ভাবটা দূর করতেই হবে। এ ব্যাপারে তার বুদ্ধি হলো, আয়নার সামনে দাড়িয়ে হাসি প্র্যাকটিস করা। মুখে যেন সব সময় একটা রহস্যময় প্লাস আকর্ষণীয় হাসি হাসি ভাব লেগে থাকে।

আর গায়ের রংটার ব্যাপারে সাইফুল–ইমরানের যৌথ বক্তব্য হলো, দুধের সর, ছানা, কাচা হলুদ, ডাবের পানি থেকে শুরু করে আলু, মরিচ, পেয়াজ, রসুন যা যা পারিস লাগাতে থাক। পরিবর্তন একটা আসবেই। অতঃপর প্রেমের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা যাবে।

ধৈর্যের চরম পরীক্ষা দিয়ে শুনলাম তাদের পরামর্শগুলো। কারণ প্রেম যে আমাকে করতেই হবে।

সামিয়াকে দেখলেই যে আমার কোথায় যেন কেমন কেমন করে। প্রেমে পড়া রোগের ঘোরে আমি যে তাকে নিয়ে নানান স্বপ্ন দেখি।

সেদিন তারা পকেটের শখানেক উদ্ধার করে তবেই ছাড়লো। এদিকে আমার সাধনাও শুরু হলো পুরোদমে। ছোট আয়নার সামনে দাড়ালে তাতে বাদর জাতীয় কিছু চোখে পড়ে বিধায় বড় আয়না কিনলাম। তাতে চললো হাসি চর্চা। মুখে হলুদ, চন্দন মাখা শুরু হলো। এ খাতে বুয়ার বেতনও বর্ধিত হলো। সমস্যা হয়ে দাড়ালো লিভিং ডল। ওটা কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। কি আর করা।

ইসমাইলের নতুন বুদ্ধি মতো বুয়ার সঙ্গেই ইনিয়ে–বিনিয়ে নানান কথা বলা শুরু হলো। জাস্ট প্র্যাকটিস। এখানেও সমস্যা। বুয়া যেন কেমন দৃষ্টিতে তাকায়! মুখ টিপে হাসে। তবু সাধনা চলতে থাকলো। প্রেমের পথে শত বাধা থাকবেই। সাহসের সঙ্গে ডিঙাতে হবে সেসব।

এক পর্যায়ে আবিষ্কার করলাম সামিয়া নয়, বরং বুয়াই আমার প্রেমে পড়তে যাচ্ছে। আমাকে দেখলে সে এখন নানান ভঙ্গিতে হাসে। টকটকে লাল লিপস্টিক মাখা নিজের ঠোট নিজেই কামড়ায়। বিনা দরকারেও কথা বলে। সেসব কথার ভঙ্গি ও ধরন আলাদা।

সেদিন আকাশে শ্রাবণের মেঘ। ছাতাটা ভাজ করতে করতে ইউনিভার্সিটির উদ্দেশ্যে তৈরি হচ্ছিলাম। বুয়া এসে বললো, *আফনের লাইগ্যা আচার আনছি, খাইবেন।* সে সঙ্গে বত্রিশ দাত প্রদর্শন।

মনে মনে কপালের ফোরটিন জেনারেশন উদ্ধার করতে করতে বের হলাম। শাটল ট্রেনে তিল ধারনের জায়গা নেই। দাড়িয়ে আছি। হঠাৎ নজরে এলো সামিয়া। বুকে ধড়াম ধড়াম শুরু হলো। তৃষ্ণা পেতে লাগলো। হাটুর কাপুনিতে মনে হচ্ছিল, পুরো ট্রেনটাসহ উল্টে পড়ে যাবো। তবু মনকে সাহস দিলাম। এমন হলে তো চলবে না! আমি তো পুরুষ। বীর পুরুষ। প্রেম আমাকে করতেই হবে। সফল হতেই হবে। মুখে প্র্যাকটিস করা হাসি হাসি ভাবটা আনার চেষ্টাকালে তার নজরে পড়ে গেলাম। সমস্ত সাহস সঞ্চার করে কাছে গেলাম।

কেমন আছো সামিয়া?

ভালো। কিন্তু তোমার হয়েছেটা কি? অমন ক্যাবলাকান্তের মতো হাসছো কেন? চেহারাটাও কেমন যেন নন্দদুলাল, নন্দদুলাল হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা কি?

আমার মুখ থেকে উত্তর–দক্ষিণ কিছুই বের হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, এ রকম আর দুই একটা কথা শুনলে হয়তো প্যান্ট ভিজিয়েই ফেলবো। ছোটকালে যা ভয় পেলে হতো। ইদানীং তা নার্ভাস হলেই হয়ে যায়।

আমার হয়ে ইসমাইল বললো, দেখো সামিয়া, আমরা সবাই ফ্রেন্ড। কিন্তু বাবু একটা লাজুক বলে তার সঙ্গে এভাবে কথা বলাটা কি ঠিক হচ্ছে?

সামিয়া বললো, সরি তাহলে আমি তো খারাপ কিছু বলিনি। তার খোজখবর নিচ্ছিলাম মাত্র।

এবার আমি বললাম, থাক ইসমাইল, ও তো ঠিকই বলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে হাসির রব উঠলো। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমিও হাসতে লাগলাম তাদের সঙ্গে।

সেদিন আবার সবাই একত্রিত হলো। আমাকে উদ্দেশ্য করে ছোড়া মন্তব্যগুলো শুনছিলাম যার সর্বনিম্নটা হলো, আমাকে হাফলেডিস বলাটাও ভুল, তারচেয়েও আমি নাকি অধম।

রেজা বললো দোস্ত, মাইন্ড করিস না। তোকে বুয়ার সঙ্গেই মানাবে ভালো। ওখানেই চালিয়ে যা।

টিটকারি শুনতে শুনতে জেদ এসে গেল। এদিকে মেঘলা আকাশ ক্রোধে ফেটে পড়তে চাচ্ছে। হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি।

সামিয়াকে দেখতেই মাথায় বুদ্ধিটা এসে গেল বিদ্যুৎ গতিতে। সে সঙ্গে আবারও সাহসী হয়ে উঠলাম। দৌড়ে গিয়ে ছাতাটা মেলে ধরলাম তার মাথায়।

সামিয়া বললো, থ্যাংকস। এমনই তো চাই।

হ্যা, এখন আমরা একই ছাতার নিচে হাটি। এখন আমি ক্যাবলাকান্তের মতো হাসিও না, আমাকে নন্দদুলালের মতোও মনে হয় না।

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি থেকে

পেচা

– হাসানুর রহমান

পেচা হলেও নিজেকে ছেলে ভাবতে আমার কষ্ট হয়, ভীষণ কষ্ট হয়। কারণ আমার চেরাহায় পুরুষের কোনো বলিষ্ঠতা নেই।

নাকটা একটু ছোট, বড় বড় চোখ দুটো কিছুটা গোলাকার। পাতলা চুল এবং পাটখড়ির মতো চিকন দেহ।

সব মিলিয়ে পেচার সঙ্গে আমার চেহারার দারুণ মিল। এ জন্য একান্ত নিজস্ব পরিমণ্ডলে আমার একটি বিশেষ নাম ছিল পেচামিয়া।

ছোট থাকতে, সম্ভবত তখন ক্লাস নাইনে উঠবো, একবার গিয়েছিলাম চট্টগ্রাম বড় চাচার বাসায়। আমাকে দেখে সবাই হই চই করে উঠলো পেচামিয়া কেমন আছো? পেচামিয়া কেমন আছো?

আমি মনে কষ্ট নিই না। হাসিমুখে বলি ভালো।

প্রকৃতির বিধান মেনে নিয়েছি নির্দ্বিধায়।

চাচার বাসায় আনন্দেই দিন কাটাতে লাগলাম। পাশের বাসায় থাকতো ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর তিন মেয়ে মিশা, দীপা ও অর্থি। চাচাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকায় আমার সঙ্গেও তাদের পরিচয়টা হয়ে গেল তাড়াতাড়ি। ওরা অবশ্য আমাকে হাসান বলেই জানতো। তিনজনের মধ্যে অর্থি ছিল খুব সুন্দরী। তার মুখশ্রী, তার দেহ পল্লবী সবই ছিল অপূর্ব। সে ছিল ভীষণ চঞ্চল এবং কথা বলার ভঙ্গি ছিল অসাধারণ।

ওদের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেল। গ্রাম্য বলে ওরা আমাকে খুবই পছন্দ করতো। আমি তাদের গ্রামের নানান কাহিনী শোনাতাম। বিনিময়ে তারাও শহরের গল্প শোনাতো।

যতোই দিন যায়, অর্থির প্রতি আলাদা টান অনুভব করি। সে না এলে ভালো লাগে না। আবার তাকে দেখলেই বুকের ভেতরে যেন হাতুড়ি পেটানো শুরু হয়। টেনিস বলের মতো দ্রুত ওঠানামা করতে থাকে। এমনি এক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে যাই।

অর্থির চাহনি ছিল খুবই তীক্ষ্ণ। মনে হতো সে যেন আমার হৃদয়ের সব কিছু দেখতে পাচ্ছে। আমার সবই বুঝতে পারছে। গল্প বলার সময় সে সারাক্ষণ অন্য রকম দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। বুঝতাম না এটা তার কোন মুগ্ধতা। আমাকে দেখে, নাকি আমার গল্প শুনে? এ জন্যই তাকে ভাবতাম সারাক্ষণ। অর্থাৎ অর্থির প্রেমসাগরে আমার জাহাজ ডুবু ডুবু। এভাবেই চলছিল আমার অশান্ত দিনগুলো।

কোনো একদিন বিকেলে তাকে একা পেলাম। অনেক সাহস সঞ্চয় করে বলেই ফেললাম, ভালোবাসি।

সে মুচকি হাসি উপহার দিয়ে চলে গেল।

সকালে আমাকে একটি চিরকুট ধরিয়ে দিল। তাতে লেখা, আজ বিকাল সাড়ে পাচটায় ছাদে আসবেন।

সামান্য একটি লাইন আমাকে কতোটুকু আনন্দ দিয়েছিল বোঝাতে পারবো না। মনে হয়েছিল আমি যেন পৃথিবীতে নেই, স্বর্গে আছি। সময় যেন কিছুতেই কাটছিল না। অবশেষে বিকেল হলো এবং ছাদে গিয়ে দেখি অর্থি আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

কাছে যেতেই কোনো কথা না বলে সে একটা শাদা খাম বাড়িয়ে ধরলো।

আমি খামটি নিতেই সে দ্রুত নিচে নেমে গেল।

আমার সেকি উত্তেজনা। বাসায় ফিরে চলে এলাম বাথরুমে। খাম খুলে যা দেখলাম তাতে মাথা ঘুরে পড়ে যাবার যোগাড়।

তিন তিনটি পেচার ছবি ছিল তাতে।

একটি সুস্থ সবল পেচার ছবি, আরেকটি ডানা ভাঙা পেচার ছবি, শেষেরটি ছিল একটি মৃত পেচার ছবি।

এতো নিখুত আর্ট না দেখলে বিশ্বাসই করা যাবে না। ছবিগুলো দিয়ে সে কি বোঝাতে চেয়েছে বুঝলাম না।

পরের দিন অর্থির সামনে পড়লে কোমলমতি অর্থির মন্তব্য, পেচার আবার শখ কতো, প্রেম করবো।

জীবনে এই প্রথম পেচা শব্দটি আমাকে আঘাত করলো।

প্রচণ্ড অভিমান হলো স্রষ্টার ওপর।

ঢাকা থেকে

লজ্জা ভাঙা

ও এবং আমি

ও বললো, চলো দুজনের রক্তের গ্রুপটি জেনে আসি।

আমিও বললাম, চলো।

ওর গ্রুপ O নেগেটিভ, আমার O পজিটিভ।

এরপর ও বললো, রাশি চক্রটি জেনে আসি। জানা হলো ওর মিথুন, আমার কর্কট রাশি।

ও বললো, চলো ওজন মাপি।

পরিমাপ হলো ওর পয়তাল্লিশ কেজি, আমার চুয়ান্ন কেজি।

ও আর কেউ নয়, ও হলো আমার ভালোবাসা, আমার স্বপ্ন।

ওকে আমি বললাম, এগারো একের পর এক পচাত্তর সাতপাচ ভাবনায় প্রায় সব কিছুই জানতে চাইলে এবং জানাও হলো।

কিন্তু একটি বিষয় বাকি রয়ে গেল।

ও বললো, কি?

আমি বললাম, তুমি এক মিনিট চিন্তা করো, বলতে পারবে।

ও চিন্তা না করে অস্থির হয়ে বললো, তুমিই বলো কি জানার বাকি আছে?

বললাম, কেনা-বেচার।

ও আরো অস্থির হলো এবং বললো, কি কেনা-বেচা?

আরো একটু ভাবো। কারণ এখন কেনা-বেচা, এখন ক্ষমতাকে জেনে নেয়া, এখন তৃপ্তিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার।

ও আরো উদগ্রীব হলো আরো বেশি অস্থির হলো। বললো, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। তুমি যা বলবে খোলাখুলি বলো এখনি জানতে চাই অজানা বিষয়টি কি?

বললাম, বিষয়টি এতো সহজ না, বিষয়টি তোমার জন্য কঠিন যা তুমি সহজেই জানতে চাইছো।

ও এবার সত্যিই রেগে গেল এবং আমার কাছে থেকে কিছুটা দূরে সরে গেল।

আমি এবার বাধ্য হলাম বলতে। ওকে বললাম, বলছিলাম রক্তের গ্রুপ, রাশি চক্র, ওজন যেমন সহজেই জানা গেল। এ বিষয়টি অতোটা সহজ নয়।

ও বললো, আবারও একই ঘ্যানর ঘ্যানর করছো।

তাহলে শোনো , বলছিলাম যৌন ক্ষমতা জানতে। বলছিলাম যৌন কেনা-বেচার কথা, যৌন তৃপ্তি বোঝানোর কথা। তুমি আমি কি পারবো বিষয়টি সুনিশ্চিত জানতে বিয়ের আগে?

ও কোনো জবাব দেয়নি সেদিন লজ্জায়।

আজও তার লজ্জা ভাঙেনি।

লজ্জা ভাঙবে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ ভালোবাসা দিবসের রাতে।

ওই দিন ওর আমার শুভ বিয়ে।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, ঢাকা থেকে

অপ্রকাশিত

বন্ধুবরেষু সাকিলের প্রশংসা যথাযথ! ভদ্রমহিলা কৌতূহলী পুরুষের কল্পনার মানসী যেন। চেহারা ছিপছিপে, হাসলে গালে টোল পড়ে, চোখ কথা কয়, চোখ হাসে, অল্প আবেগে নাকের পাটা কেপে ওঠে, হৃদয়ভেদী চাহনি। দুই সন্তানের জননী হলেও সব মিলিয়ে বয়স সত্যিকার তুলনায় অনেক কম। গুরুতর অসুস্থতার জন্য সাকিলের টিউশনি বদলি যোগদানে তার সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, গ্রামীণ পরিবেশ থেকে পড়াশোনা করতে সবেমাত্র ঢাকা এসেছি। মেসে থাকি। সেখান থেকে নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রছাত্রীকে পড়াই। বন্ধুটি সুস্থ হয়ে ঢাকা ফিরলে গৃহকর্তা তাকে অন্যত্র একটি টিউশনি ঠিক করে দিয়ে কি মনে করে আমাকে নিয়মিত করে রাখেন। মহিলা তার প্রবাসী স্বামীর পরিবার থেকে নিরাপদ দূরত্বে ছেলেমেয়ে নিয়ে বসবাস করেন। খানিকটা দূর থেকে ভাইয়েরা প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তবে ঢাকা শহরে একাকী বসবাসের শক্তি, সাহস ও বুদ্ধিমত্তা তার রয়েছে।

আমার শিক্ষালয়ে যাতায়াতে একটু অসুবিধা হলেও কিছুদিন পর ছাত্রছাত্রী এবং তার মায়ের প্রবল আগ্রহে সার্বক্ষণিক গৃহশিক্ষকতার ভূমিকায় বাসায় চলে আসি। সেই ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের এড়িয়ে চলার প্রবণতার জন্য ভাবীসাহেবা ও বন্ধু মহলে আমি রসিকতার পাত্র। হয়তো সে জন্যই এ উঠতি বয়সী যুবকের প্রতি গৃহকর্ত্রীর অন্য রকম দৃষ্টি প্রথম থেকে পড়লেও একটু দেরি করে ব্যাপারটি উপলব্ধি করেছি।

তার বিবাহিত জীবনের ষোল বছরের মধ্যে বারো বছর স্বামী বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন দেশে কর্মরত। হয়তো সে জন্য সর্বদা হাসি-খুশি প্রাণবন্ত লতাআপা ভেতরে ভেতরে মনমরা। যৌন অতৃপ্ত মধ্য বয়সী নারী প্রায়ই নানান ছলে আমাকে তার হৃদয়ের অব্যক্ত কথা শুনিয়ে যন্ত্রণা ভুলতে ব্যর্থ চেষ্টা করেন।

হৃদয়ের আচরণ চিরকালই বিচিত্র। গ্রাম্য লাজুক, বোকা বোকা চেহারার ছেলেটি সহসা বদলে যেতে থাকে। আপা কি এক সম্মোহনী শক্তি বলে আমার হৃদয়ের অলি-গলি, চেতনার এক বিশাল অংশ দখল করে নেয়।

সহসা তৈরি হয় দেহ সর্বস্ব সম্পর্ক। সংসারের সকল দায়িত্ব এসে পড়ে আমার ওপর। খানকিটা কঠিন হলেও আপার দায়িত্ব পালন করতে ভালোই লাগে। সমস্ত লজ্জা-সংকোচ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে এক অভিজ্ঞ যৌবনবতী নারীর দেহের ভাজে ভাজে নিজেকে স্থাপন করে জাত-মান-কুল বিসর্জন দিয়ে সুখের সাগরে নিরন্তর অবগাহন করি।

সে কি প্রশান্তি! ভালো লাগলে মানুষ তার ভালোলাগাকে ইচ্ছাধীন করে রাখতে পারে। কিন্তু ভালোবাসলে মানুষ নিজেই ভালোবাসার ইচ্ছাধীন হয়ে যায়।

আপাকে ভালোবেসে ফেলি। হোক না তা অসম বয়সের পরকীয়া। পোষা পুষির মতো তার একান্ত বাধ্য হয়ে পড়ি। সতর্ক দৃষ্টিতে একই ছাদের নিচে অলিখিত স্বামী-স্ত্রীর মতো আমাদের বসবাস।

একদা জানাজানি হলে আত্মীয় মহল থেকে চাপ আসে। আপা তার কাছে গচ্ছিত সম্পদ সব নিয়ে সকল কিছু ছেড়ে আমার সঙ্গে ঘর বাধার কথা বললে লোভ আমাকে তাড়িত করে। আমার বিবেকের ওপর কালো পর্দা নেমে আসে।

এই আবেগ বিহ্বল সময়ে আমার এক প্রিয় শিক্ষকের পরামর্শে আপার উদাত্ত আহ্বান সত্ত্বেও বাস্তবে ফিরে আসি। আপার বেশ কিছু টাকা নিয়ে এক আদম ব্যবসায়ীর সহায়তায় বিদেশে গিয়ে কৌশলে তার স্বামীকে দেশে পাঠিয়ে দিই।

তারপর বিদেশে কাজ করে আপার টাকা পরিশোধ করে খারাপ অনুভব হলেও বিনা নোটিশে যোগাযোগ বন্ধ করে ফেলি।

অনেক দিন পর দেশে ফিরে জানতে পারি আপা তল্পি-তল্পাসহ বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন স্বামী-সন্তানসহ এবং ভালো আছেন।

এরপর আমি বিয়ে করি। আমার স্ত্রী এক অসাধারণ ঘরনী। আমার অতীতের কালো অধ্যায় তাকে বলাতে তিনি মনঃক্ষুণ্ন হলেও আমাকে ক্ষমা করেছেন। তিনি বর্তমান কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী। আমাকে আপা প্রথম যৌবনে ভালোবাসা শিখিয়েছেন, অর্থ সাহায্য করে ঋণী করেছেন। আপার প্রিয় যাযাদিতে সেই স্মৃতিমূলক লেখাটি ছাপা হলে অবশ্যই তার চোখে পড়বে, সে জন্য এই রোমন্থন। আপা যে দেশে বাস করছেন সে দেশে ব্রোকেন ফ্যামিলির সংখ্যা অনেক। উপলব্ধি কম হয়নি।

আমার ভাবতে ভালো লাগছে, আপার সংসারটি এখনো অটুট। আমাদের সেই দিনের পরিণয়হীন সম্বন্ধের জন্য বেদনার চেয়ে আমার বিস্ময় যেন বেশি। আপা তুমি ভালো থেকো।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

ঢাকা থেকে

অসামাজিক

তখন আমি পাবনা এডয়ার্ড কলেজে বিজ্ঞানে থার্ড ইয়ারে পড়ি। আমার বাড়ির পাশেই চাচার বাড়ি। মাত্র বিশ গজ দূরে বাড়ি। *শুকতারা* নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করে আমার চাচাতো ভাই। মেয়েটি আমর চাচাতো ভাইয়ের আপন খালাতো বোন। অর্থাৎ খালোতা ভাইবোনে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ে হয়েছিল ১৯৯৮ সালে।

আমার ভাবীর ঘরে কারণে অকারণে যেতাম। নানান রকম গল্প করতাম। আমার ভাই ছিলেন ভাবীর কাছে অযোগ্য। ভাই নাকি তার যৌন তৃপ্তি মেটাতে অক্ষম। এ জন্য তিনি ভাইয়ের সঙ্গে প্রায়ই ঝামেলা করতেন। ঠিক এই সময় আমার উদয় হলো তার কাছে। আমি একজন ছাত্র এবং অবিবাহিত। ফলে কোনো মেয়েকে কাছে পাওয়া আমার জন্য ভাগ্যের ব্যাপার ছিল। সে মেয়ে বিবাহিত–অবিবাহিত যাই হোক।

ভাবী ছিলেন লিকলিকে গড়নের। কথা বলতে বলতে একদিন ভাবীর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ি। সে সময় তাকে জড়িয়ে ধরেছি। উভয়ের শরীর গরম হয়ে গেছে। ভাবীকে চুমু খেতে থাকলাম। ভাবীও আমাকে চুমু খেলেন অনেক।

সেই শুরু হলো ভাবীর–আমার পরকীয়া প্রেম। এভাবে এক বছর আমাদের মেলামেশা চললো গোপনে। ভাবী আমার পড়ার ঘরে আসতেন। এখানেই কাজ করতাম।

একদিন ভাবীকে জড়িয়ে ধরে আমার ঘরের মধ্যে চুমু দিচ্ছি এমন সময় একজন দেখে ফেলে। ফলে আমরা উভয়ে নার্ভাস হয়ে যাই। এবং আমার হার্ট এটাক হয়। আমার না বাচার অবস্থা। আমাকে বন্ধুরা পাবনা সদর হাসপাতালে ভর্তি করলো। ঠিক একইভাবে ভাবীকেও ভর্তি করা হলো।

ডাক্তার বললেন, কোনো রোগ নেই। অতিরিক্ত টেনশনে এ রকম হয়েছে।

তিন দিন হাসপাতালে ছিলাম। আমি নিচের তলায় আর ভাবী উপরের তলায় ভর্তি। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মাত্রই ঘটনা আমার গ্রামে রটে যায়। তিন দিন পরে রিলিজড হয়ে আসি।

হাসপাতাল থেকে আসার পর ভাবীর সঙ্গে আমার দেখা করা এবং কথা বলা সব নিষেধ হয়ে গেল। বাধার মুখে প্রেম আরো জটিল হয়ে গেল।

ঘটনা প্রকাশ হয়ে গেলে ভয়–ভীতি, লজ্জা সব কেটে গেল। আরো সংগ্রামী প্রেমিক হলাম। ভাবলাম সম্মানের যখন কিছুই বাকি থাকলো না তখন ভাবীকেই বিয়ে করবো। তাই গোপনে আবার মেলামেশা শুরু হলো।

ইতিমধ্যে আমি বেকারত্ব থেকে মুক্তি পেলাম। পাবনা স্কয়ারে একটি চাকরি হয়ে গেল। আর কি চিন্তা?

চাকরির বয়স মাত্র সাত দিন। এক রাতে ভাবীকে বের করে নিয়ে চলে এলাম পাবনাতে। রাতের মধ্যেই ভাবীকে গোপনে বিয়ে করলাম। অবাক হলো গ্রামের লোকজন। গ্রামের লোকজন আমার এই বিয়ে মেনে নিল না। তারা আমাকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করলো।

সমাজে আমাকে একঘরে করে রাখা হয়েছে। গত ইদুল ফিতরে আমার ফিতরা গ্রহণ করেনি সমাজ। আমার এবং ভাবীর বাড়ির কেউই ঘটনা মেনে নেয়নি। আমার ভাই অন্যত্র বিয়ে করেছেন। বর্তমানে বৌকে নিয়ে বাড়ি ভাড়া করে থাকি।

সমাজ, দেশ কারো সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। সমাজপতিরা যেদিন আমার এই পরকীয়া প্রেমকে মেনে নেবে সেদিন আমার গ্রামে বৌকে নিয়ে ফিরে যাবো। প্রেমকে মূল্য দিয়ে আজ সব ছেড়ে বনবাসের মতো জীবন যাপন করছি।

আগেই বলেছি, আমার প্রেমিকা ভাবীর নাম ছিল শুকতারা। আমার জীবনে দুঃখের কারণে সে তারার মতোই জ্বল জ্বল করছে। কিন্তু সমাজের চোখে আজো আমি কলংকিত।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

কুষ্টিয়া থেকে

সুদ- আসল

এক বছর হলো আমাদের বিয়ে হয়েছে। ভালোবাসার বিয়ে। আমি একটি বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করি। প্রতি সপ্তাহে বাড়ি আসি। মাসের শেষ সপ্তাহে স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাই। যে সময়ের ঘটনা লিখছি তখন দুই দিন ছিল সাপ্তাহিক ছুটি। ফলে একবার শ্বশুরবাড়ি এলে দুই দিন থাকতাম।

বৃহস্পতিবার কি উপলক্ষে যেন ব্যাংক বন্ধ ছিল। ফলে ছুটি পেলাম তিন দিন। বুধবার সন্ধ্যায় শ্বশুরবাড়ি চলে এলাম। আমাদের জন্য দক্ষিণ দিকের একটি ঘর নির্দিষ্ট থাকে। আমি সাধারণত এ ঘরেই থাকি। এ পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম হয়নি। বুধবার রাতেও দক্ষিণ দিকের ঘরেই কাটালাম স্ত্রী নীলাসহ।

আমার একমাত্র শ্যালিকা রীমা। বিয়ে হয়েছে দেড় মাস হলো। তার স্বামী কবির একটি এনজিওতে কর্মরত। মাসে একবার বাড়ি আসে। নীলা আর রীমা প্রায় একই রকম দেখতে। ঠিক যেন জমজ বোন। ঘটনা এই রীমাকে নিয়ে।

ঘটনার দিন বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে এক চাচাতো শ্যালককে নিয়ে ঘুরতে বের হলাম। স্থানীয় বাজারে আড্ডা দিয়ে সন্ধ্যা সাতটার দিকে বাড়ি ফিরে এলাম। আমি ঘরে ঢুকে বিছানায় গিয়ে বসলাম। নীলা আলমারির ড্রয়ারে কি যেন খুজছিল। ঠিক তখনি বিদ্যুৎ চলে গেল। আমি আলমারি বন্ধের শব্দ শুনতে পেলাম। বিছানায় রাখা মিনি রেডিওটা হাতড়িয়ে পেয়ে অন করলাম। ঠিক তখনি নীলা আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমিও ঠিক থাকতে পারলাম না। দরজা বন্ধ করে নীলাকে কাছে টেনে নিলাম। বুঝলাম নীলা আরো কিছু চাচ্ছে। তাই আস্তে আস্তে দুজনেরই কাপড় খুলে এক হয়ে মিশে গেলাম।

কিছুক্ষণ পর উভয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়লে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম।

ঠিক তখনি বিদ্যুৎ চলে এলো।

আমি ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম।

এতো নীলা নয়!

রীমা! কিন্তু ততোক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে।

আস্তে করে শুধু বললাম, তুমি? কখন এলে? কবির আসেনি?

তারপর রীমার কাছ থেকে যা জানলাম তা হলো কবিরকে নিয়ে বিকেলেই তারা এসেছে। কবিরকে নিয়ে শ্বশুর সাহেব ঘুরতে গেছেন বাজারের দিকে। তাদের জন্য এ ঘর ঠিক করা হয়েছে। আমরা থাকবো পূর্ব দিকের ঘরে। রীমাই আলমারির ড্রয়ারে তার অলংকার গুছিয়ে রাখছিল। সে আমাকে কবির মনে করে। ফলে আজ এ ঘটনা ঘটলো। নীলা আর শ্বাশুড়িআম্মা পাশের বাড়িতে গেছেন কার যেন বাচ্চা দেখতে। বাড়িতে তখন রীমা ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। কবির তো মাসে মাত্র একবার বাড়ি আসে শহর থেকে। আজ সকালেই বাড়ি এসেছে। তারপর রীমাকে নিয়ে বিকেলে এখানে এলো। যেহেতু বাড়িতে কেউ নেই, রীমা চেয়েছিল এ সময়টাতেই কবিরকে নিয়ে...। সে ভাবেনি আমি এভাবে ভুল করে এ ঘরে আসবো এবং এ রকম অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটবে।

যাহোক, আমি শুধু বললাম, এতোদিন আসলই পেতাম। আজ সুদও পেলাম।

রবীন্দ্রনাথের কথাই ঠিক – স্ত্রী হচ্ছে আসল আর শ্যালিকা হচ্ছে সুদ। আসলের চেয়ে সুদই বেশি মিষ্টি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গাজীপুর থেকে

ছোট্ট বুড়ি তানহা

– পপি

আমাদের সাত বছরের ছোট্ট মিষ্টি মেয়ে তানহা একদিন আমাকে প্রশ্ন করলো, আম্মু, ভালোবাসা মানে কি?

আমি অবাক হয়ে মজা করে বললাম, তুমি এতো সব টিভি চ্যানেলে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ছবি দেখেও এখনো ভালোবাসাই বুঝলে না মা? ভালোবাসা মানে হলো, মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা, স্নেহ, মায়া, মমতা, আদর, আকর্ষণ, অনুভূতি, বিশ্বাস। এসব মিলিয়েই হয় ভালোবাসা। এটা অবশ্য অন্যান্য প্রাণীর মাঝেও আছে।

আমার কন্যা কতোক্ষণ চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে বললো, এতো কঠিন করে বললে কি আমি বুঝি? আমি ছোট মানুষ না?

তাই তো, আমি তো খেয়ালই করিনি। তার বোঝার ছোট্ট পরিসরে এভাবে সে ভালোবাসার অর্থ কি বুঝবে? আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, আম্মু, তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করো, সে তোমাকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দেবে।

রাতে টিভি দেখতে বসে সে তার বাবাকে ভালোবাসার অর্থ জিজ্ঞাসা করলো। তার স্বল্পভাষী বাবা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বললো, আমার তানহা বুড়িই, আমার ভালোবাসা।

কন্যা আমার আরো রেগে গেল। ভালোবাসা সম্পর্কে তার যতোটুকুই ধারণা ছিল, বাবা মায়ের ডেসক্রিপশনে সেটুকুও অস্পষ্ট হয়ে গেল।

এর কয়েকদিন পর তার বাবা দেশের বাইরে গেল কিছুদিনের জন্য। মাঝে মধ্যেই তার যেতে হয় ব্যবসায়িক কাজে। এর আগে মেয়ে আমার ছোট্ট ছিল। ফলে তার অনুভূতি ছিল কম। এছাড়াও আগে আমরা একান্নবর্তী পরিবারে ছিলাম। সেখানে বাবা না থাকলেও তার দাদু, ফুপু, চাচা–চাচি, কাজিন সকলের সান্নিধ্যই সে পেতো। ফলে বাবার অনুপস্থিতি তাকে খুব একটা বিচলিত করতো না। কিন্তু এবার সে অন্য রকম। তার বাবাকে বিদায় দিয়েই সে শান্ত হয়ে গেল।

সেদিনই তাকে তার বন্ধুর বার্থডে পার্টিতে নিয়ে গেলাম। সেখানেও তার চোখ সর্বক্ষণই ছল–ছল। সবাই অবাক চঞ্চলা–চপলা, হাস্যোজ্জ্বল তানহা–কে হঠাৎ এরূপ ঠাণ্ডা, শান্ত, স্থির দেখে। আমিও তখন বুঝতে পারিনি তার এতোটা মন খারাপের কারণ। বুঝলাম রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় সে যখন কাদো কাদো হয়ে বললো, আম্মু,আমার বাবা কবে আসবে?

তাকে আদর করে বললাম, শিগগিরই আসবে মা, ঘুমাও।

দুর্ভাগ্যবশত এবারই তার বাবার ফিরতে অনেক দিন লেগে গেল। এদিকে মেয়ে আমাকে অস্থির করে তুলছে তার বাবার কথা জিজ্ঞাসা করে করে। সে বুঝতে পারছে না যে তার মাও তার বাবার অপেক্ষায় প্রতিটি প্রহর গুণছে।

অবশেষে তার বাবা এলো। তার মেয়ে ছুটে গেল বাবার বুকে। বাবাও তাকে আদরে আদরে ভরিয়ে তুললো। পরদিন থেকে আমার মেয়ের চলন বলনই অন্য রকম। বাবার আনা চকলেট, ক্যানডি খাচ্ছে, সবাইকে দিচ্ছে। নতুন পাওয়া খেলনা দিয়ে খেলছে আর মিষ্টি হেসে দৌড়াচ্ছে সারা বাড়িময়। আমি তখন তাকে ডেকে বললাম, আম্মু, ভালোবাসা মানে কি জানো? এই যে বাবা বিদেশ চলে যাওয়ার পর তোমার এতো কান্না। এতো মন খারাপ আর বাবাকে পেয়ে তোমার এতো আনন্দ, এতো উল্লাস, এটাই ভালোবাসা।

আমার মেয়ে এবার বিজ্ঞের হাসি হেসে বললো, আম্মু, এবার আমি বুঝেছি ভালোবাসা কি।

এখন সে প্রায়ই দুষ্ট হেসে বলে, আম্মু, আমার বাবাকে ভালোবাসি।

আমি অভিমানের সুরে প্রশ্ন করি, আর আমাকে?

হ্যা, তোমাকেও।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, মগবাজার, ঢাকা থেকে

তুমি

– মোহাম্মদ সায়েমউদ্দীন

আমি চান্দু।

আরে, অই চান্দু,বিড় বিড় কইরা কি কস?

পিপল কা সরি, পরিচয় দিতাছি।

ধুৎ।

রনি চলে যায়, যাক! বলছিলাম আর কি।

আমি চান্দু। বাবা মায়ের দীর্ঘ পাচ বছরের প্রেমের প্রথম ফসল। বাবার অন্ধ আকাঙ্ক্ষা তার ছেলে ডাক্তার হবে। আমি উত্তরোত্তর পরীক্ষায় ডাব্বা মেরে বাবার স্বপ্নের বাচ্চা বানাচ্ছি। প্রাইভেট পড়ার নাম করে একবার বের হতে পারলেই রাত দশটার আগে বাসায় ফিরি না। এভাবেই এসএসসি-তে দুইবার অগৌরবে বোল্ড হই।

বাবা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। বলেন, এই হারামজাদাকে দিয়ে কিছু হবে না। হারামজাদার কোনো প্রতিভাই নেই।

বাবার ভুল ধারণায় আমি মনে মনে বগল বাজাই। পাড়ার প্রতিটি ষোড়শীর দৈনন্দিন কর্মসূচির অধিকাংশই আমি জানি। মেয়েও তো আল্লাহর রহমতে কম নয়। পাক্কা ছয় কুড়ি। কে কোন স্কুলে পড়ে। কার কি নাম। কোন মেয়েটি কতো সুন্দর। কোন মেয়েটি সেদিন স্যানডাল দেখিয়েছিল এমনতর হাজারো প্রশ্নের উত্তর আমার মজ্জাগত। কিন্তু হায়! বাবাকে তা কে বোঝাবে? বাবার অধ্যবসায় দেখে হর্ষোৎফুল্ল হই। মানে সকাল বিকাল গালি বর্ষণে আমার কান দুটো ধন্য হতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক অধ্যবসায়ের শুভ ফল পেলেন। অর্থাৎ বাবা মায়ের প্রথম সন্তান আমি চান্দু তৃতীয়বারের সিংহ প্রচেষ্টায় ম্যাট্রিক পাস করে বাবাকে ধন্য করে দিই।

আমি আর গায়ে লেখাপড়া করবো না। সিদ্ধান্তটা বাবাকে জানাই। বাবা চোখ দুটো মুরগির আন্ডার মতো করে বিস্মিত হন, কেন?

মনে মনে বলি, তোমার স্বৈরশাসনে আর কি। কিন্তু মুখে বলি শহরে গিয়ে ভালো কলেজে পড়বো। আসলে আমি একটু স্বাধীনতা চাইছিলাম। সেখানে প্রতিদিন বাইরে বাইরে থাকার জবাবদিহি করতে হবে না। হলোও তাই। শহরে এলাম। টাংকিবাজ এবং মিছিলবাজি একটা কলেজে টুক্কুস করে ভর্তি হয়ে গেলাম। যখন-তখন এই কলেজে মিছিল করে ওর চামড়া তুলে নেয়া হয়। অবশ্য প্রত্যেক কলেজের অবস্থা অথৈবচ।

ফার্স্ট ইয়ার কেটে গেল নতুন জায়গায় অবস্থা বুঝতে। সেকেন্ড ইয়ারে ক্লাস করতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, আমার সঙ্গে যেসব ছেলেমেয়ে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছিল তাদের প্রায় সবাই খুব চামে আছে। তাদের অনেকেই ঠ্যাংয়ের সঙ্গে ঠ্যাংয়ের প্যাচ লাগিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে মেয়েদের সঙ্গে হেভি আড্ডা দিয়ে যাচ্ছে। আর আমি কিছুতে নেই। নাহ! লাইফ স্টাইলটা পাল্টাতে হবে।

একদিন ক্লাসে যেতে দশ মিনিট লেট হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সিড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে দেখি আমাদের ক্লাসের একটি মেয়ে উঠছে। ভাবলাম এই সুযোগে একটু চান্স নিয়ে ফেলি। কিন্তু কেমন আছো, কি খবর এই জাতীয় কথা তো সবাই বলে। আমাকে নতুন কিছু বলতে হবে। আমি তাকে নতুন কিছু বললাম এবং বলার পর আতংকিত হয়ে টের পেলাম, আমি তাকে বলেছি, তুমি তো বেশ মোটা।

একটি মেয়েকে প্রথম এ ধরনের বাক্য শোনালে তার কি অনুভূতি হতে পারে তা আমার জানা ছিল না।

তবে মেয়েটি হঠাৎ থেমে বললো, কেন, মোটা কি তোমার পছন্দ নয়? কোল বালিশ হিসেবে ভালোই। এই বলে এক দৌড়ে ক্লাসে ঢুকে পড়লো। তারপর ভয়ে আমি দুই দিন ক্লাসে যাইনি।

দুই দিন পর গিয়ে সেই মেয়েটি আমাকে দেখে টুথপেস্টের মডেলিং করে হেসে ইশারায় কাছে ডাকলো। কাছে যেতেই সে আবার পেপসজেল–এর মডেল হয় এবং বলে, তোমার মোটা চর্চা কেমন চলছে?

শুনে আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে যেন। তারপর এ–কথা, সে–কথা। সে আমাকে স্মার্ট বলে। উপদেশ দেয় যেন একটু ফিটফাট হয়ে চলি। এরপর যথারীতি আমি ফিটফাট। কলেজ ক্যাম্পাসে আমাদের দুই জনের গুজুর গুজুর, ফুচুর ফুচুর।

একদিন মেয়েটির সিদ্ধান্ত চকভিউ মার্কেটে দেখা করতে হবে। অর্থাৎ ডেটিং আর কি! দুইজন আইসক্রিম খাবো, গল্প করবো। আরো কতো কি। সাধের ডেটিংয়ের জন্য পরদিন ঘুম থেকে উঠেই গোফ জোড়া বিসর্জন দিলাম।

১০০% হালাল সাবান দিয়ে গোসল করলাম। ইশ, নগদ তেরোটা টাকা গেল। জিন্সের প্যান্ট–শার্ট পড়লাম। মনটা জ্বলন্ত প্রতিভা, অথচ সেই আমার কি না। কিছু মনে পড়বে না? তা কি করে হয়। মনে পড়লো। সেন্ট ধার করে গায়ে মাখলাম। গ্লাসে তাকিয়ে নিজেই নিজেকে চিনতে পারছি না।

কলেজে গেলাম। একে একে সব বন্ধুরা আমাকে বলতে লাগলো, আমাকে নাকি মুখ ছোলা হনুমানের মতো লাগছে।

যাক, তাদের কথায় কান দিলাম না। শুধু মনে মনে বললাম, প্রেম–পিরিতের তোরা এসব কি বুঝবি। একটা রিকশা নিয়ে চকভিউ মার্কেটে চলে এলাম। ফুলের দোকান থেকে রজনীগন্ধা কিনলাম। বেরিয়ে গেল অনেক টাকা। ধার করে আনা ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই বুকের বোটা ছিড়ে কলজে যেন বেরিয়ে আসতে চাইলো। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে আরো ৩০ মিনিট লেট। না, এমন দেরি বরদাস্ত করা যায় না।

দুই তলায় আইসক্রিম শপের কাছে তার থাকার কথা। তড়িঘড়ি উঠে এলাম। দেখলাম ঠিকই চিড়িয়া অস্থির হয়ে ঘোরাফেরা করছে। আহা! জাদুসোনা, খুব কষ্ট দিলাম, ও...না, না, এমন তরো আর কখনো হবে না। এসব কথা আওড়াতে আওড়াতে একবারে বলতে গেলে উড়ে চলে এলাম তার কাছে। আবেগে আমার চোখ একেবারে অন্ধপ্রেম, গদগদ ভাব দেখিয়ে বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে আনা ইংরেজি ডায়ালগ ছেড়ে বললাম, ইউ আর দি বেস্ট, ডার্লিং। রজনীগন্ধা বাড়িয়ে দিলাম।

কিন্তু ও বাবা! রজনীগন্ধা নিমেষেই আমার গায়ে, মাথায়, পিঠে চপেটাঘাতের মতো পড়তে লাগলো। আমি দেরি করেছি বলে সে রাগ করেছে হয়তো।

আর তখনি ওনার গলার সাউন্ড পেলাম।

আম্মা, কি করছো এসব?

তারপর তুমুল ফুলপেটা শেষ হলে মেয়েটি অবাক বিস্ময়ে বললো, তুমি!

চট্টগ্রাম থেকে

ভালোবাসা ভালো নয়

– সাগর সেন

পড়ালেখা শুরুর পথে এবং শরীরে যৌবনের ছোয়া না লাগতেই বাবা মা বিয়ে দিয়ে দিল। মেয়েদেরকে জোর করে বিয়ে দেয়ার মতো। অনেক না বলার পরও কেউ কথার কর্ণপাত করেনি। মেনে নিলাম ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কেননা যাকে বিয়ে করেছি তার কোনো দোষ নেই। সে অশিক্ষিত হলেও খুবই সহজ–সরল। কিন্তু বিয়ের আগে যে ভালোবাসাবাসি তা আর কখনোই হয়ে ওঠেনি। যদিও না জেনে অনেকেই ভালোবাসতে চেয়েছিল। প্রগতিশীল একটি পার্টি করতাম বলে প্রতারণা করতে পারিনি। তাই সহজ–সরল বৌ নিয়ে এক রকম সুখেই ছিলাম। কিন্তু ভালোবাসার জিদ রয়ে গেল।

আট দশ বছরের মাথায়ও যখন কোনো সন্তানের বাবা হতে পারিনি তখন সবাই বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিল। বিয়ে তো একবারই হয়। অনেক টাকা–পয়সা খরচ করে ডাক্তার দেখিয়েও কোনো লাভ হলো না। বললো, সন্তান না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। চলে এলাম বিদেশে।

বিদেশের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে পত্রমিতালি করে সময়টাকে একটু এনজয় করতে ছেলে এবং মেয়ে বন্ধুদের অনেক চিঠি পেলাম। মেয়েদেরকে বললাম, আমি স্বল্প শিক্ষিত। বিয়ের ব্যাপারটা চেপে গেলাম। চেপে গেলাম এ কারণে যে, দেশে গেলে বিয়ে আমাকে সবাই মিলে দেবেই। এমনকি স্ত্রীও বলবে।

যাক একজন উচ্চ শিক্ষিত মেয়ের সঙ্গে চিঠিপত্র লেনদেন চলছিল। তাকে বার বার বোঝালাম যে, এ অসম বিয়ে কিছুতে হতে পারে না। কেননা আপনার–আমার ব্যবধান আকাশ–পাতাল। কিন্তু সে কিছুতেই মানছে না। বললাম, ছুটিতে এলে তখন ভেবে চিন্তে দেখা যাবে। সে আমার কথা মানছে না। আমাকে এখনই কথা দিতে হবে।

বললাম, অন্য রকম সমস্যা আছে।

বললো, অসুবিধা নেই।

বললাম, আপনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবো না।

বললো, আমি সব কিছু শিখিয়ে দেবো। তারপরও বললাম, সম্ভব নয়। বললাম, তোমার বিয়ের সব খরচ আমি বহন করবো।

বললো, না, তোমাকেই চাই।

মনে মনে চিন্তা করলাম, এতো উচ্চ শিক্ষিত মেয়ে কেন বার বার আমার মতো একটা স্বল্প শিক্ষিত ছেলেকে এমন করে চাচ্ছে, মনে সন্দেহের দানা বাধতে শুরু হলো। তার চিঠিতেই জানতে পারলাম তারই মতো উচ্চ শিক্ষিত ছেলে তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। ভাবলাম আর কিছু নয়তো।

তিন বছর চিঠির ভালোবাসার অবসান ঘটিয়ে ছুটিতে দেশে গেলাম। আমার সহজ–সরল স্ত্রীর দাবি তার বিধবা ছোট বোনকে বিয়ে করতে। বললাম, তা কি করে সম্ভব।

বললো, না, তা করতেই হবে।

শ্বশুর–শাশুড়ি বসে আছে আমাদের বাড়িতে। তাদের বিধবা মেয়েকে আমার কাছে বিয়ে দেয়ার জন্য। তাদেরকে এবং স্ত্রীকে বোঝালাম এ সম্ভব নয়। কেননা তাতে তোমারই কপাল ভাঙবে। শ্বশুর–শাশুড়িকে বললাম কি করে ভাবলেন আমি আবার বিয়ে করবো এবং তাও আপনাদের বিধবা মেয়েকে।

তাদের কথা হলো, বিধবাকে কে আবার বিয়ে করবে, কচি মেয়ে।

আমার বাবা মাও তাদের সঙ্গে একমত। যাকে দুধ খেতে দেখেছি হাজার বার কোলে নিয়েছি তাকে কি করে বিয়ে করি? এ যে একেবারে অসম্ভব। কেউ মানতে রাজি নয়। বললাম, বিয়ে যদি আমাকে করাতে চান তাহলে অন্য মেয়ে দেখুন।

সবাই চুপ। গেলাম পত্রমিতার বাড়ি। পরিচয় দিলাম তার পত্রমিতার বন্ধু। গিয়ে দেখি বয়স আমার থেকে বেশি। চেহারার কথা নাইবা বললাম। ভাগ্য ভালো সঠিক পরিচয় দিইনি। সেখান থেকে চলে আসার আগের দিন হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে শুরু করলো কান্না। বললাম, কি হয়েছে।

বললো এখান থেকে উদ্ধার করতে।

জড়িয়ে যেভাবে ধরেছে তাতে চরিত্রের ব্যাপারে সন্দেহ জাগলো। ইশারা করতেই কাবু হয়ে গেল।

বললো, রাতে হবে।

ভাবলাম এ কোন চক্করে পড়লাম। রাতে ঠিকই কথা রেখেছে। বিছানায় এসে হাজির।

সঠিক পরিচয় দিলাম আসার সময়। এক মাস পর যাবো বলে চলে এলাম। মনে মনে ভাবলাম, পত্রমিতার বন্ধু পরিচয় দিয়েও এ অবস্থা। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভুল ঠিকানা দিয়ে এসেছি। সেই ঠিকানায় চিঠি দিয়ে উত্তর না পেয়ে বেয়াইকে সঙ্গে নিয়ে ভুল ঠিকানায় খোজাখুজি করে না পেয়ে বেয়াই-এর কাছে লজ্জিত হলো। এ বেয়াই তার চরিত্রের কারণে বিয়ের কথা হওয়ার পরেও করেনি। বিদেশ থেকে যাওয়ার সময় তার জন্য অনেক কিছু আনতে বলেছে টাকা নেবো এ শর্তে। পরে যখন গেলাম টাকার জন্য পাচ মাস পর তখন এমনভাবে আটকিয়ে ফেললো যে, বিয়ে না করে আসার অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। বাধ্য হলাম।

অনেক কান্নাকাটি করেছি গোপনে। প্রথম বিয়ের কথা বললাম।

মেনে নিল। বললো, কোনো সমস্যা নেই।

ভাবলাম বোধহয় দেবী পেয়েছি। বাড়ি, নিয়ে এলাম। সহজ-সরল স্ত্রীও মেনে নিল। বিয়ের কিছুদিন পরই বুঝতে পারলাম তার প্রেমিকদের সংখ্যা ডজনের উপরে। এবং সঙ্গে বাজে মন্তব্য। একজন শিক্ষিত মেয়ের এই চরিত্র। প্রথম সহবাসে মনে করেছি বয়সের কারণে...। পরে তো আর বোঝার বাকি নেই।

কিছু বললেই এখন বলে, কপাল গুণে পেয়েছো এতো বড় শিক্ষিত।

বিদেশ চলে এলাম। ছেলে হলো। চার বছর পর বাড়ি গেলাম। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে বলে বসলো, শুয়রের বাচ্চা।

বললাম, উদ্ধার করার অবদান এই পেলাম।

সহজ-সরল বৌ চলে গেল চিরতরে। বিয়েও হয়েছে অন্যখানে। এখন আমি আছি পত্রমিতা প্রেমিকা বৌয়ের শুয়রের বাচ্চা গালি শুনে।

তাই বলছি, ভালোবাসা ভালো নয়। জানি না তা কি শুধু আমার বেলায়?

রিয়াদ, সউদি আরব থেকে

ঘুণে ধরা

– শাহানা বেগম

১৯৮৬–র কোনো এক বিকেলে। ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্রী আমি। বই খাতা নিয়ে রিকশায় বসে হাওয়া খেতে খেতে চলেছি প্রাইভেট পড়তে গণিতস্যারের বাসায়। ভালোলাগার রঙিন পালকগুলো মনের ডানায় ভালোবাসা হয়ে একে একে সবে জায়গা করে নিতে শুরু করেছে। তাই মনে মনে কল্পনার জাল বুনছি আগামীর। হঠাৎ এক পলকে সবগুলো সূতো এক সঙ্গে ছিড়ে কুটি কুটি হলো। ছোট্ট হৃদয় হলো ফালি ফালি। কারণ ছোট্ট, তবু অসম্ভব অন্য রকম।

সামনেই শোভন প্রাসাদ। তার দোতলার রান্নাঘর থেকে মোটা নল বয়ে এসেছে নিচে একেবারে নর্দমার ওপর। সেই নল বেয়ে নর্দমার পচা দুর্গন্ধময় এদো কাদায় পড়ে আছে কিছু উচ্ছিষ্ট পোলাও আর রোস্টের বড় বড় হাড়। তারই পাশে বসে এক অর্ধউলঙ্গ যুবক নর্দমার নোংরা থেকে বেছে বেছে পোলাও খাচ্ছে।

ওহ খোদা! এ কোন দেশে বাস করছি আমরা? খাবারগুলো ফেলে না দিয়ে তাকে আগেই দিয়ে দিল না কেন, কেন, কেন? ছোট্ট হৃদয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাজারটা প্রশ্ন এসে ভিড় করে। মানুষ এমন লজ্জাহীন নিষ্ঠুর হয়! ভেতরটা কুকড়ে এতোটুকু হয়ে গেল। অপ্রতিরোধ্য বিভীষিকা দ্বিতীয়বার চেয়ে দেখতে ইচ্ছে হলো না। কিন্তু কি এক অজানা মায়ায় সেখানে চোখ দুটো আটকে রইলো যতোক্ষণ দেখা যায়।

জটা চুলের অর্ধপাগল ওই যুবককে এ শহরের সবাই তখন চিনতো এক অপরিণামদর্শী খান বাহাদুরের নাতি হিসেবে। অর্ধাহারে অথবা দীর্ঘ দিনের অনাহারে সে আজ লোকান্তরে।

প্রায় সতেরো বছর পার হলো। আজো খাবার টেবিলে পোলাও অথবা রোস্ট আমাকে সেই দৃশ্যটা মনে করিয়ে দেয়। কিছুতেই মন থেকে মুছতে পারি না। তবে কি আমার কিশোরী হৃদয়ে ওই ক্ষুধার্ত যুবকের জন্য ক্ষণিক ভালোবাসা জন্মেছিল? কাউকে বলতে লজ্জা করে।

তবে কি আমি এখন এই ঘুণে ধরা লজ্জাহীন সুশীল সমাজের একজন?

হয়তো বা।

নওগা থেকে

নিভৃতচারী

আমি পুরুষ। বয়স ছেচল্লিশ। যৌবনের শেষ আর প্রৌঢ়ত্বের শুরুর সন্ধিক্ষণে আছি। আমার ভেতরে সকল চেতনা ঠিক আগের মতো আছে। একেবারেই অপরিবর্তিত।

আকাশের নীল, বসন্তে বাতাসের গান, পাতার সবুজ, ঘাসের ডগার শিশির বিন্দু সকালের মিষ্টি রোদের প্রতিফলন এবং ধান ক্ষেতের ছন্দময় দোল আমাকে আনন্দিত ও আন্দোলিত করে। এর

চেয়েও আমাকে বেশি আকর্ষণ করে রমণীর শরীর। বিমোহিত করে তার হাসি। তার চুড়ির রিনি ঝিনি, খোপার ফুল, হাওয়ায় ওড়া শাড়ির আচল আমাকে পাগল করে তোলে। মনে হয় ছাত্র জীবনের সেই আমিই আছি। উদ্দাম, শক্তিমান, সুঠাম। সমস্ত চিন্তার ভুবন এবং শরীরের বিস্তৃত অনুভবের বৃত্তে নিজেকে পূর্ণ যৌবনময় মনে হয়।

আমি বিবাহিত। বাবা। দুই সন্তান। ওরা খুবই প্রাণবন্ত, উচ্ছল। যৌবনের আগমন তাদের দেহ এবং মনে স্পষ্ট।

সমাজ, রীতি, নিয়ম এবং প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী আমি সিনিয়র। বয়স্ক, মুরুব্বি। অনেক কিছুই আমার করা সাজে না যা তারা করতে পারে।

আমার যাতনা এখানে।

আমার বেদনাও এখানে।

মানুষ হিসেবে আমার স্ত্রী চমৎকার। খুবই ভালো। তার আচার–আচরণ, মায়া–মমতা, আন্তরিকতা ও সহমর্মিতা প্রশংসনীয়। আমার প্রতি তার আস্থা ও ভালোবাসা অফুরন্ত। সত্যিই অন্তর থেকে তাকে ভালোবাসি আমিও।

এ পর্যন্ত লিখেই আমার কথা শেষ হতে পারতো। হয়নি। আর হয়নি বলেই আজ এই লেখা।

গত দশ বছরে আমার স্ত্রীর শারীরিক সাহচর্যের আগ্রহ কমতে কমতে এখন প্রায় শূন্যে এসে পৌছেছে। দিন, রাত, সপ্তাহ, মাস চলে যায়, তার কোনো ইচ্ছাই হয় না।

এই বয়সের, এই মধ্য বয়সের অনেক পুরুষের মতো শারীরিক আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায় আমার। অতৃপ্তির অনুভূতি সারাক্ষণ আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অনেক রাত নির্ঘুম কাটাই আকাশের তারা গুণে, পত্রিকা পড়ে কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রেখে। অনেক একাকী সময় আমার কেটে যায় দুর্বার আবেদনময়ী কোনো রমণীর উষ্ণ সান্নিধ্য কল্পনা করে।

সমাজ এবং বাস্তবতা আমাকে নিবৃত্ত করে, বন্দী রাখে। মাঝে মধ্যে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিছু একটা করে ফেলতে দুর্নিবার ইচ্ছা হয়। তীব্র যন্ত্রণা সত্ত্বেও সংযত হই। নিজেকে শাসন করি। কষ্ট পাই। সত্যি বড় কষ্ট পাই।

চল্লিশ থেকে ষাট বছরের ভয়ংকর যাতনাময় দুই দশক অতিক্রম করছে অনেক পুরুষ। নানান কারণে কোনো সম্পর্ক কোথাও করতে পারছে না। নিজেরাও তারা একত্রিত হতে পারছে না কোনো ক্লাব কিংবা সমিতি নেই বলে। মনের লুকিয়ে থাকা বেদনার কথা নিঃসঙ্কোচে সহমর্মী কারো কাছে প্রকাশ করতে পারলে হয়তো ভালো লাগতো। হয়তো দুঃখের ভার হালকা হতো। মনের জানালা দিয়ে সুখের একটু হাওয়া আসতে পারতো।

আমি নারী নই। ধারণা করি, চল্লিশ বছরের বেশি বয়সের অনেক নারীও কষ্ট পাচ্ছে একই রকম। তাদের সঙ্গী পুরুষেরা শারীরিক শক্তি ও আকর্ষণ হারিয়ে হয়তো অক্ষম হয়ে আছে। আর এরা বুকের ভেতরে কামনার দহন নিয়ে বরফ ঢাকা নদীর মতো শান্ত–শীতল জীবন যাপন করছে। নিয়মের শৃঙ্খলে বন্দিনী, অসহায় এবং নিরুপায়।

এপারে আমরা অনেক পুরুষ। ওপারে ওরা অনেক নারী। মাঝখানে সমাজের আরোপিত বাধার সুকঠিন প্রাচীর।

আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস কি এই দেয়াল ভেঙে অজস্র হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসকে আনন্দের উষ্ণ নিঃশ্বাসে পরিণত করতে পারবে? আমরা কি নিজেদের মনকে উদার করে, সংসারের কারো স্বার্থে আঘাত না করে, নিজেদের প্রফুল্ল সুস্থ ও পরিতৃপ্ত জীবন উপহার দিতে কোনো পথ খুজে পাবো?
আহা! যদি কিছু সময়ের জন্য হলেও নির্মল আকাশের শাদা মেঘের মতো হালকা হয়ে ভাসতে পারতাম, প্রাণ খুলে যদি বন্ধনহীন হাসতে পারতাম!

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

অসাধ্য শর্ত

– আহমদ হাসান খান

১৯৫৭–এর আগস্ট মাসে আমি করাচি যাই এবং ১৯৭২ সালে সেই আগস্ট মাসেই বিস্ময়করভাবে করাচি থেকে পালিয়ে ভারত হয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসি।
করাচিতে আমার কলেজ জীবনের লেখাপড়ার অধ্যায়টি কাটে। আমি ছিলাম মেজভাইয়ের পোষ্য। তিনি নৌবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। সরকারি বাসায় আমরা থাকতাম। মেজভাই যুদ্ধ জাহাজে কর্মরত থাকায় মাসের প্রায় চব্বিশ দিনই সমুদ্রে অথবা অন্য দেশে থাকতেন। আমার দায়িত্ব থাকতো ভাতৃবধূ এবং তার দুটি পুত্রকে সামলানোর।
একদিন হঠাৎ করে সাড়ে দশটায় বাসায় ফিরে এসে দেখি বাসার বাইরের দরজা খোলা। ভেতরে এসে আমার রুমের দরজা খোলা পেয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে দেখি একটি মেয়ে আমার বিছানায় শুয়ে আমার রেডিও শুনছে। আমি বললাম, বাহ! চমৎকার তো!
আমার কথা শুনে মেয়েটি তড়াক করে উঠে বসলো। এদিকে কিচেন থেকে ভাতৃবধূ দেখতে এসে হাসতে লাগলেন। বললেন, বেশ হলো! দুজনের শেষে দেখা–সাক্ষাৎ হয়েই গেল।
মেয়েটি পা বাড়িয়ে বললো, আমি এখন আসি খালা, পরে আসবো।
ভাতৃবধূ জানালেন, মেয়েটি পাশের বাড়ির। পাশের বাড়ির সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় ছিল না। এই মেয়ের কারণে তার পিতা–মাতা এবং ভাই–বোনেরা পরিচিত হতে থাকলো। ক্রমেই আমি যেন তাদেরই একজন হয়ে গেলাম।
মেয়েটির নাম মুসাররত। সে তখন কেবল ক্লাস নাইনের ছাত্রী। লম্বায় সে আমার তুলনায় একটু ছোট। তার আকর্ষণীয় সম্পদ হলো ডাগর এক জোড়া চোখ এবং সরু কোমর। মাঝে মধ্যে সে আমাকে জর্দা রান্না করে পাঠায়। কখনো তার বাবাকে দিয়ে ডাকিয়ে নিয়ে মাংস রুটি খাওয়ায়।
আমার থার্ড ইয়ারের কালে পাচ বন্ধুর এক বন্ধু একদিন বেড়াতে এসে মুসাররতকে দেখতে পেল। পরদিন আমাকে প্রশ্ন করে যে, আমি ওই মেয়ের প্রেমে পড়েছি কি না। না সূচক জবাব দেয়াতে বন্ধুটি বললো, জীবনে যদি বিয়ে করতে হয় তো ওই মেয়েকেই সে বিয়ে করবে।
দিন গত হচ্ছিল নিজ নিয়মে। বিএ পাস করার পর চাকরিও পেয়ে গেলাম। চাকরি হওয়াতে আমার দাম বেড়ে গেল। এতোদিন মুসাররতের জননী পর্দা করেছেন। এখন তিনি খোজ নিতে আমাদের

বাসায়ও চলে আসেন। জর্দা, ফিরনি এই সব এনে খাওয়ান। এ স্নেহ, এ আদরের রহস্য কিছুই বুঝতে পারিনি। কেননা তারা পাঞ্জাবি এবং আমি বাঙালি। অপরদিকে তারা ছিল কাদিয়ানি গোত্রের। পয়ষট্টির যুদ্ধের পর ভাতৃবধূকে মেজভাই বাড়িতে রেখে এলেন। তিনি নৌবাহিনী থেকে রিলিজ নেয়ার চেষ্টা শুরু করেন। অপরদিকে আমি লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি ও পেশোয়ার গিয়ে চাকরি করে এলাম। তারপর একদিন অনুভব করলাম যে, মুসাররত আমাকে আরও সফল করতে পারবে। এই ভাবনায় তাড়িত হয়ে তার পিতাকে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব দিলাম।

তার পিতা রাজি হলেন। কিন্তু শর্ত দিলেন যে, আমাকে তাদের জামায়াতে যোগদান করতে হবে। অর্থাৎ আমাকেও কাদিয়ানি হতে হবে।

আমার পক্ষে কাদিয়ানি হয়ে যাওয়ার বিষয়টি কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। তাই আমার জীবনের প্রথম প্রেমের ভরাডুবি হয়ে গেল। ১৯৭০ সালে তার ফুপাতো এক ভাইয়ের সঙ্গে মুসাররতের বিয়ে হয়ে গেল। তাকে আমি একটি ডিনার টেবিল এবং একটি সিলিং ফ্যান উপহার দিই যেন আমার উপহার তার স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে থাকে।

তারপর এলো একাত্তর। তারা আমাকে পাহারা দিতো। আমার কাছে তাদের এই অবদানটুকু ভাস্বর হয়ে আছে।

টাঙ্গাইল থেকে

ঘৃণা

আমি তখন ক্লাস টেনের ছাত্রী। আমাদের গ্রামেই একটা ছেলেকে আমার খুব পছন্দ হতো। কি করবো ভেবে পাই না। আমার এক বান্ধবীর মাধ্যমে আমার ভালোলাগার কথা তাকে জানাই। সঙ্গে একটি চিঠি দিই। ছেলেটি তখন এসএসসি পরীক্ষার্থী। কোনো সাড়া-শব্দ পাই না। হঠাৎ একদিন আমার সামনে এসে বলে, তুমি খুব সুন্দরী। আমার এসএসসি পরীক্ষা হয়ে যাক তারপর আমার মনের কথা জানাবো।

আমি ধৈর্য ধরতে লাগলাম। কবে এসএসসি পরীক্ষা শেষ হবে। অবশ্য প্রায়ই আমাদের মাঝে দেখা হয়। তার পরীক্ষা শেষ হলো, অপেক্ষায় থাকলাম তার মনের কথা শোনার জন্য।

কিছুদিন পরেই আমার বান্ধবীর হাত দিয়ে সে চিঠি দিয়েছে। চিঠি পড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। জাহিদ আমার ভালোবাসা গ্রহণ করেছে।

এভাবে পাচ মাস কেটে গেল। এরই মধ্যে জাহিদ এসএসসি রেজাল্ট নিয়ে যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজে ভর্তি হলো। জাহিদ প্রতি সপ্তাহে যশোর থেকে চিঠি দেয়। বাড়িতে এলে আমাদের দেখা হয়।

আমাদের বাড়িতে জাহিদকে সবাই পছন্দ করতো। সেই জন্য বাড়িতে এলে কেউ কিছু বলতো না।

জাহিদ একদিন আমার কপালে, দুই গালে, থুতনিতে এবং ঠোটে চুমু দিয়ে বলেছিল, তুমি আমার ভালোবাসা, তোমাকে ছাড়া কিছুই ভাবতে পারি না। জীবনে যদি বিয়ে করি তাহলে সে হচ্ছে তুমি।

জাহিদের ওই দিনটার কথা আমি আজও ভুলতে পারি না। ইতিমধ্যে আমিও এসএসসি পাস করেছি। আমার আব্বা বিদেশ থাকতেন। বিদেশ থেকে আব্বা ছুটিতে দেশে এসেছেন। এসেই আমার বিয়ের জন্য পাত্র খোজা শুরু করেছেন। আমার খুব কান্না পাচ্ছিল। আম্মাকে আমার মনের কথা জানিয়ে

দিলাম। আম্মা আমাদের সম্পর্কটা জানতেন। আব্বাকে আমার পছন্দের ছেলের কথা আম্মা বলেন। জাহিদকে আমি বাড়িতে আসতে বলি। জাহিদ বাড়িতে এলে তাকে বিয়ে করার জন্য বলি।

জাহিদ কিছুই বলে না। শুধু বলেছিল, আমার পক্ষে এখন বিয়ে করা সম্ভব নয়।

আমি কান্নায় বুক ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। বাড়ির সবাই জেনে গেল ব্যাপারটি। আব্বা আবারও পাত্র খুজতে লাগলেন। ছেলে জাপানে থাকে। ছুটিতে এসেছে। তার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করে এলেন আব্বা।

বাড়িতে সবাই এক সঙ্গে বসে দিন তারিখ নির্ধারণ করছিল। সেই সময় সবার সামনে এসে জানিয়ে দিই, তোমরা যদি এখন আমার বিয়ে দাও তাহলে আত্মহত্যা করবো।

পরে সেই বিয়ে ভেঙে যায়।

দশ দিন পর আব্বা সউদি আরব চলে যান।

চলে যাওয়ার কিছুদিন পরে আব্বাকে চিঠি লিখি। আব্বা সে চিঠির কোনো উত্তর পাঠাননি। এমনকি অন্য কারো চিঠিতেও আমার কোনো খোজখবর নেননি। তারপরও পর পর ছয়টি চিঠি দিই, তারও কোনো উত্তর পাইনি।

পাচটি মাস এভাবেই কাটলো।

হঠাৎ একদিন টেলিফোনে বিদেশ থেকে খবর এলো, আব্বা মারা গেছেন। সেদিন দুই চোখে পানি ছাড়া কিছুই ছিল না। নিজেকে নিজে ঘৃণা করতে শুরু করলাম। আমি খুনি, পাপী, আমার জন্যই আব্বা মারা গেছেন। বার বার নিজের কাছে প্রশ্ন করতে লাগলাম, সেদিন কেন আব্বার কথা শুনলাম না।

ছোট থেকেই আব্বা আমাকে খুব ভালোবাসতেন। এখনো নিজেকে অপরাধী ভাবী। জানি না আব্বা আমাকে ক্ষমা করেছেন কি না।

যার জন্য আমি আব্বার পছন্দ করা পাত্রে সঙ্গে বিয়ের পিড়িতে বসলাম না, পেলাম না আব্বার কাছ থেকে কোনো চিঠির উত্তর, তাকে কিভাবে ভালোবাসবো।

সেই দিন থেকে জাহিদকে ভালোবাসতে পারিনি। এই ভ্যালেনটাইনস দিনে যাকে চোদ্দটি লাল গোলাপ দিয়ে ভালোবাসা জানাতাম তাকে আজ আমি প্রচণ্ড ঘৃণা করি।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা থেকে

তুমি আসবে

– জুহি

তুমি তো ফিরিয়া যাবে আজ বৈ কাল –
আমার যে ফিরিবার পথ রাখো নাই আর,
ধূলিসাৎ করেছ যে প্রাণের আড়াল
–রবীন্দ্রনাথ

চলেই যখন যাবে তবে এসেছিলে কেন আমার জীবনে? বেশ তো ছিলাম, বেশ তো কাটছিল আমার প্রতিটি দিন হাসি–ঠাট্টায়, বাবা–মা, বন্ধু–বান্ধবীদের সঙ্গে। কিন্তু হঠাৎ করে কি থেকে কি হয়ে গেল। তোমার আগমন হঠাৎ করেই। আবার হঠাৎ করেই প্রস্থান। আমি তো চাইনি তুমি এসো আমার জীবনে। তবুও এলে কেন? আর এলেই যখন, তো চলে গেলে কেন? যাওয়ার আগে একটুও প্রয়োজন বোধ করলে না বলে যাবার।

আমি তো চেয়েছিলাম তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে। কিন্তু তুমি দাওনি, দাওনি তুমি আমাকে যেতে। তবে তুমি কোন অধিকারে আমার কাছ থেকে চলে গেলে। আচ্ছা ভালো কথা, তুমি চলে গেছো। তোমার প্রতি যদি আমার ভালোবাসা সত্যিই হয় তবে তোমাকে আবার ফিরে আসতেই হবে আমার কাছে।

ভালোবাসা তাও যদি ফিরে নেবে শেষে
কেন লজ্জা কেড়ে নিলে, একাকিনী ছেড়ে দিলে
বিশাল ভবের মাঝে বিবসনা বেশে
– রবীন্দ্রনাথ

টাঙ্গাইল থেকে

অকৃত্রিম

– জিদনী

ভালোবাসা শব্দটি আমার ভীষণ প্রিয়। কারণ এর ক্ষেত্রটি প্রেমের মতো সংকীর্ণ নয়, অনেক বিস্তৃত। ভালোবাসা সবার জন্য। মা–বাবা, ভাই–বোন, আত্মীয়–স্বজন, বন্ধু–বান্ধব সবাই হতে পারে ভালোবাসার পাত্র। কিন্তু প্রেম শুধু নয় নারীর জন্য, প্রেমিক–প্রেমিকার জন্য। ভালোবাসা যদি হয় বটবৃক্ষ, প্রেম তার একটি শাখা মাত্র। তাই ভালোবাসতে বড় ভালোবাসি।

অধিকাংশ মানুষের ভালোবাসার তালিকার শীর্ষ স্থান জুড়ে থাকে মা–বাবা, ভাই–বোন, আত্মীয়–স্বজন, বন্ধু–বান্ধব কিংবা মনের মানুষটি। আমার ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। আপজনদের আমিও ভালোবাসি। কিন্তু তাদের পাশাপাশি আমার ভালোবাসার তালিকার শীর্ষে এমন কিছু মানুষের নাম আছে যা শুনলে লোকে হাসাহাসি করে। আমার ভালোবাসার মানুষের নাম শুনে বন্ধুবান্ধবেরা এ ওর গায়ে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। কারণ সমাজের চোখে যারা নিম্নবিত্ত বলে পরিচিত, অর্থের বিচারে অনেক নিচে যাদের অবস্থান, আমার ভালোবাসার তালিকার শীর্ষে তাদের নামটিই জ্বলজ্বল করে। আজ আমি একে একে তাদের কথাই বলবো।

তখন আমরা লালবাগে থাকি। একদিন সকালে স্কুলের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখি একটা রিকশাও নেই। আশপাশে অনেকক্ষণ হেটেও রিকশা পেলাম না। হতাশ হয়ে যখন হেটে স্কুলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছি তখনই একটা খালি রিকশা দেখতে পেলাম। আনন্দে বাকবাকুম হয়ে বললাম, যাবেন?

কই যাইবেন?

অগ্রণী স্কুল।

ওঠেন।

উঠে পড়লাম। রিকশা চলছে। হঠাৎ মনে হলো, এই সেরেছে! ভাড়াটা ঠিক করে নিলাম না কেন? স্কুলে গিয়ে রিকশাচালক যদি ঝামেলা করে? রিকশাচালকের দিকে ভালো মতো তাকিয়ে ভয়টা আরেকটু বাড়লো। বুড়ো রিকশাচালক। আমার অভিজ্ঞতা অনুসারে বুড়ো রিকশাচালকদের ঝামেলা পাকানোর সম্ভাবনা শতকরা ৯৯.৯ শতাংশ। স্কুলে পৌছে ভয়ে ভয়ে পাচ টাকার নোটটা এগিয়ে দিলাম। রিকশাচালক ঝগড়ার বদলে যে *ক্লোজআপ স্মাইল* দিলেন তাতে মনে হলো, তাকে বুঝি পাচশ টাকা দেয়া হয়েছে। আমি অবাক হলাম। এ হাসি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করা চলে না।

এরপর থেকে প্রায় প্রতিদিন সকালে তিনি রিকশা নিয়ে গলির মোড়ে অপেক্ষা করতেন। আমিও বাসা থেকে বেরিয়ে তাকে খুজতাম। সকালে বেরিয়ে এই বৃদ্ধ মানুষটিকে না দেখলে সারাদিন অস্থির হয়ে থাকতাম।

তিনি দারুণ মজা করে কথা বলতেন। বলতেন, *জানো মা, আমি আগে মন্ত্রী আছিলাম, সকলে আমারে সালাম দিতো।*

এসব শুনে খুব হাসতাম আর তাকে ডাকতাম মন্ত্রীচাচা বলে।

একদিন সকালে স্কুলে পৌছেই বান্ধবীর সঙ্গে দেখা। চাচার ভাড়াটা দিয়ে বললাম, আসি চাচা, আসসালামু আলাইকুম।

বান্ধবীটি চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইলো। চাচা চলে যাবার পর জিজ্ঞাসা করলো, উনি তোর চাচা?

আমি সহজভাবে বললাম, হ্যা।

দুই দিন পর ক্লাসের এক ঠোট কাটা মেয়ে আমাকে একা ডেকে নিয়ে বললো, তোমার কোন চাচা নাকি রিকশা চালায়?

আমি হেসে বললাম হ্যা, আমার আপন চাচা।

এ নিয়ে ক্লাসে কতো হাসাহাসি। কিন্তু তাদের এতো হাসি আমাকে যা দিতে পারেনি তা চাচার ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত মুখের হাসি আমাকে দিয়েছে। অপরিসীম প্রশান্তি। শ্রমজীবী মানুষের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আমি আর কোথায় পাবো?

আরেকজন মানুষ যাকে পরিচ্ছন্ন দেহে, পরিচ্ছন্ন পোশাকে কোনোদিন দেখিনি তিনিও আছেন আমার ভালোবাসার তালিকায়। তিনি এলাকায় পরিচিত ছিলেন ময়লা ফেলার বুয়া হিসেবে। সারাদিনের জমিয়ে রাখা উচ্ছিষ্ট ফেলার বিনিময়ে মাসের শেষে পেতেন দশটি করে টাকা। এ টাকাটা দিতেও অনেকে দেরি করতো। হয়তো সারাদিনের শত কাজের ভিড়ে এ ছোটখাটো মানুষটার ক্ষুদ্র পারিশ্রমিকের কথা মনেই থাকতো না।

মাঝে মধ্যে যখন বুয়ার সঙ্গে গল্প করতাম, ,তিনি অনুযোগ করে বলতেন, *আইচ্ছা আফা, দশ ট্যাহা কি বড়লোকের কাছে কুনো ট্যাহা? এই কয়ডা ট্যাহার লিগা যদি বাড়ি বাড়ি ধরনা দেওন লাগে, তয় যাই কই?*

আমরা যেদিন বাসা পাল্টালাম সেদিন বুয়াকে বললাম, বুয়া, আমরা তো চলে যাচ্ছি, আর আসবো না। আপনার এ মাসের টাকাটা নিয়ে যান।

চইলা যাইবেন আফা, আর আইতেন না?

না বুয়া, আর বোধহয় আসা হবে না।

বুয়া কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, *আফা আমারে এট্টু পানি দিবেন?*

আমি পানি এনে দিলাম। বুয়া সেই পানি দিয়ে হাত ধুয়ে, ভালোভাবে মুছে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, *আফাগো, দোয়া করি, আল্লাহ আপনের বালা করুক।*

অবাক হয়ে দেখলাম, মানুষটার দুই চোখে পানি টল টল করছে।

এলাকা ছাড়লাম। আশপাশ থেকে হারিয়ে গেল মন্ত্রীচাচার স্নেহমাখা মুখ, বুয়ার আন্তরিক হাসি। কিন্তু মন্ত্রীচাচার স্নেহাশীষ আমার জীবনের পাথেয় হয়ে রইলো। বুয়ার সে অশ্রু আমাকে যা দিয়েছে সারা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ জড়ো করেও তার মূল্য দেয়া সম্ভব নয়।

আরো একজন মানুষের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা পেয়েছি যার কথা না বললেই নয়। তার নাম কাদেরভাই। অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে চানাচুর বিক্রি করতেন। প্রতিদিন তার কাছ থেকে চানাচুর কিনতাম। শেষের দিকে এমন অবস্থা হয়েছিল যে, দূর থেকে আমাকে দেখলেই তিনি চানাচুর বানানো শুরু করতেন। একদিন তাকে বললাম, আচ্ছা কাদেরভাই, আপনি যে চানাচুর বানাচ্ছেন, আমার কাছে যদি টাকা না থাকে?

তয় কি অইছে, একদিন ফিরি খাইবেন।

বলেন কি, আপনার লস হবে না?

কতা নি কইলেন আফা? আন্নে আরে বাই কইছেন, আই বুঝি বইনেরে কদ্দুর চানাচুর খাওয়াইতাম হাইত্তান ন?

স্কুল থেকে আমাদের যেদিন ফেয়ারওয়েল দেয়া হলো সেদিন কাদেরভাইয়ের সঙ্গে ছবি তুলেছিলাম। পরে সেই ছবি প্রিন্ট করে কাদেরভাইকে দিলাম। চেয়ে দেখি, দুই চোখ আনন্দ অশ্রুতে প্লাবিত, মুখটা নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত।

এই কাদেরভাইয়ের মুখও আমার হৃদয়ের অ্যালবামে বন্দী হয়ে গেছে। এসএসসি পাস করে স্কুল ছেড়েছি। ছিড়ে গেছে অগ্রণীর সঙ্গে আমার এগারো বছরের বন্ধন। মন্ত্রীচাচার স্নেহ, বুয়ার মায়া আর কাদেরভাইয়ের মমতা ছেড়ে আজ আমি অনেক দূরে। জীবনের চলমান পাতা থেকে হারিয়ে গেছে তাদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। কিন্তু সত্যিই কি হারিয়ে গেছে? থাক সে কথা।

আমার এ ভালোবাসা নিয়ে আশপাশে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অন্ত নেই। কিন্তু সব অগ্রাহ্য করার শক্তি আমি পেয়েছি শ্রমজীবী মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা থেকে।

অনেকে হয়তো বলবেন, এটা সহানুভূতি, ভালোবাসা নয়। কেউ বলবেন করুণা। কিন্তু আমি জানি, আমার মন জানে তাদের কতোটা ভালোবাসি, কতোখানি ফিল করি, কতোটা মিস করি। তাই ভালোবাসা দিবসে আমার ভালোবাসার মানুষের জন্য রইলো শুভ কামনা আর ভালোবাসা।

আশকোনা, ঢাকা থেকে

হারপিক

তার নামটা আমি উল্লেখ করলাম না। তবে টেলিফোনে তাকে পিয়া বলে ডাকতাম। পিয়ারা ছিল আমাদের এলাকায় সবচেয়ে প্রভাবশালী। তাদের বাসায় ভাড়া থাকতাম। আমার ছোট বোনের বান্ধবী হওয়ায় আমাদের বাসায় সে প্রায়ই আসতো।

খুব সুন্দরী ছিল পিয়া। আমি পড়তাম ক্লাস টেনে আর পিয়া পড়তো ক্লাস সিক্সে। কিন্তু পিয়ার শরীর ছিল বেশ বাড়ন্ত। মনেই হতো না সে ক্লাস সিক্সে পড়ে। আমাদের বিল্ডিংয়ের আরো দুইজন ছেলে পিয়ার সঙ্গে প্রেম করতে চাইতো। কিভাবে যেন শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গেই ওর সম্পর্কটা হয়ে গেল। পিয়া এতো সুন্দর ছিল যে, তার তুলনায় আমি কিছুই ছিলাম না। প্রথম প্রেমে মানুষের আবেগটা খুব বেশি থাকে। আর সেটা যদি হয় কৈশোরের প্রেম, তাহলে আবেগটা থাকে পুরো ষোলআনা।

একবার দুইজন কথা বলতে গিয়ে তার ইমিডিয়েট বড় বোনের কাছে ধরা খাই। যার প্রেক্ষিতে সবাই জেনে যায়। এই জন্য চার মাস তার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ছিল। চার মাস পর সম্পর্ক ঠিক হয়ে যায়। এরপর থেকে আমরা খুব সাবধানে কথাবার্তা বলতাম।

বেশ কিছুদিন ধরে পিয়ার সঙ্গে সেভাবে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। তাই একদিন বললাম, আগামীকাল সকাল নয়টার দিকে বাসায় এসো। সামনে এসএসসি পরীক্ষা থাকায় পড়ালেখার বেশ চাপ ছিল। বন্ধু মহসীনকে নিয়ে বাসায় বসে প্রায়ই বুককিপিং করতাম।

সেদিন ছিল ১৮ ফেব্রুয়ারি। মহসীন সকাল সাড়ে আটটার দিকে বাসায় আসে। মহসীনকে নিয়ে আমি সামনের রুমে পিয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। বাসার সবাই বুঝলো, আমি দরজা আটকিয়ে মহসীনকে নিয়ে পড়ালেখা করছি। প্রায়ই দরজা আটকিয়ে পড়ালেখা করতাম। তাই কেউ-ই সন্দেহ করতো না।

আমরা যে রুমে ছিলাম সেই রুমেরই বাইরের দরজা দিয়ে পিয়া ঠিক নয়টার সময় রুমে প্রবেশ করে। আমি, পিয়া, মহসীন বসে কথা বলতে থাকি। পিয়ার পরনে ছিল স্কুল ড্রেস। স্কুলের কথা বলে পিয়া আমার রুমে প্রবেশ করে। আমার বন্ধু রুমের ভেতরে থাকায় পিয়া কথা বলতে বেশ অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

পিয়ার মনোভাব বুঝতে পেরে মহসীনকে বললাম, তুই দরজা খুলে বারান্দায় গিয়ে বস।

বিপদটা হয় এর কিছুক্ষণ পরই। আমার মেজ বোন অন্য দরজা দিয়ে বারান্দার দরজা খুলতেই দেখে মহসীন বারান্দায় একা বসে আছে। তখনই তার সন্দেহ হয়। মহসীন যেহেতু বারান্দায় একা, রুমের ভেতর নিশ্চয়ই কেউ আছে। ওনারা বুঝে যান রুমের ভেতর পিয়া আছে।

আমরা তখনো কথা বলে যাচ্ছিলাম। আব্বা বাজার থেকে আসার পর আব্বাকে ঘটনা বলা হয়। আব্বা বাইরে থেকে দরজা খুলতে বলেন। মহসীনকে আমি বারান্দা থেকে রুমে নিয়ে আসি। মহসীন আমাকে জানায় তোর বোন আমাকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখেছে। এদিকে আব্বা আমাকে দরজা খুলতে বলছেন। তখনো বুঝতে পারছিলাম না কি করবো। পিয়াকে বললাম, তুমি খাটের নিচে যাও। কিন্তু পিয়া নড়ছিল না। তার সুন্দর মুখটা লাল হয়ে রয়েছে।

পিয়াকে বললাম, এখন লজ্জার সময় না। তুমি তাড়াতাড়ি খাটের নিচে যাও। এই কথা বলে তাকে প্রায় জোর করেই খাটের নিচে ঢোকালাম। এরপর দরজা খুললাম।

আব্বা বললেন, কি করছিস?

বললাম, মহসীনকে নিয়ে বুককিপিং করছি।

আব্বা বললেন, রুমের ভেতর আর কে ছিল?

বললাম, আর কেউ না।

আব্বা যেখানে দাড়িয়ে ছিলেন সেখান থেকে পিয়ার জামা দেখা যাচ্ছিল। মহসীনকে আব্বা বললেন, তুমি বাসায় যাও। আমাকে বললেন, আমি জানি রুমে কে আছে। আজ তোর পিঠের চামড়া ওঠাবো। এই কথা বলে আব্বা গেলেন বেত আনতে।

আব্বার রুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আম্মা দরজা পেছন দিয়ে লাগিয়ে দিল। আব্বাকে আমরা প্রচণ্ড ভয় পেতাম। যেহেতু আব্বা ঘটনা জেনে গেছেন, তাই আমি বাসা থেকে বেরিয়ে গেলাম।

সিড়ি দিয়ে নিচে নামছি এমন সময় পিয়ার মায়ের সঙ্গে দেখা। আমাকে বললেন, তোমার আম্মা বাসায় আছে? আমি তোমাদের বাসায় যাবো।

তাকে হ্যা বলেই উপরে বাসায় এলাম। আমার বোনকে বললাম, পিয়ার মা আমাদের বাসায় আসছে। এরপর আমি বাসা থেকে বেরিয়ে এলাম। প্রথমে ভাবলাম আর জীবনেও বাসায় ফিরবো না। যেদিকে মন চায় সেদিকে চলে যাবো। প্রথমত. আব্বার ভয়, দ্বিতীয়ত. লজ্জা। বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করে কোনো উপায় না দেখে রাত আটটার দিকে বাসায় ফিরে এলাম। এসে যা শুনলাম তাতে প্রচণ্ড শক খেলাম।

ঘটনাটি ছিল এই রকম – আব্বাকে রুমের মধ্যে আটকিয়ে পিয়াকে খাটের নিচ থেকে আম্মা বের করে। আম্মাকে জড়িয়ে ধরে পিয়ার সে কি কান্না। আমার বোন এসে পিয়াকে বলে, তোমার মা আমাদের বাসায় আসছেন। এই কথায় পিয়া ভয় পেয়ে আমাদের বাথরুমে ঢোকে। এদিকে পিয়ার মা আমাদের বাসায় এসে কি এক কাজে যেন আবার ছাদে যায়। সময় অনেক হওয়াতে পিয়া দরজা না খোলায় আব্বার মনে সন্দেহ হয়। আব্বা আম্মাসহ সবাই পিয়াকে দরজা খুলতে বলেন। বাথরুমে টয়লেট পরিষ্কার করার হারপিক ছিল। পিয়া সেই হারপিক খেয়ে দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায়। পিয়ার এ অবস্থা দেখে সবার মাথা খারাপ। পিয়ার মা ছিলেন ছাদে। তাকে গিয়ে আব্বা ঘটনাটা বলেন বাসায়। বাসায় আসতে বলেন। তিনি বাসায় আসেন। সঙ্গে পিয়ার এক ভাইও আসে। পিয়ার ভাই আব্বাকে বলে, ডাক্তার নিয়ে আসেন। আমরা ডাক্তার আনতে গেলে সবাই আমাদের চিনবে। এতে বদনাম হবে।

আব্বা ডাক্তারকে সব বলাতে ডাক্তার বললো, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রোগী বাচাতে হলে অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে তাড়াতাড়ি মেডিকালে নিয়ে যান।

বাসায় এসে আব্বা অ্যাম্বুলেন্সের কথা বলাতে পিয়ার মা এবং ভাই বললো, এতে করে ঘটনা সবাই জেনে যাবে। তাতে মান সম্মান যাবে। পিয়ার মুখের ভেতর আম্মা কিছু টক আচার দিয়ে গলার ভেতর হাত ঢোকান। এতে কাজ হয়। পিয়া বমি করে এবং সব হারপিক বেরিয়ে যায়। সবাই এতে হাপ ছেড়ে বাচে।

এর বেশ কিছুদিন পরে পিয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হারপিক খেয়েছিলে কেন?

পিয়া বললো, দেখলাম, সবাই যখন জেনে গেছে, লজ্জায় মুখ দেখাবো কিভাবে? এ জন্যই মরতে চেয়েছিলাম।

প্রেমের জন্য হারপিক খাওয়ার ঘটনা আমার তো মনে হয় ইতিহাসে এই প্রথম।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

দোজখে

– পারুল

তখন নকল–টকল করে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছি থার্ড ডিভিশনে। পাশের বাড়ির আমার প্রেমিক, আমার প্রাণপুরুষ আওয়াল দুইবারেও বি.এ পাস না করতে পেরে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে।

আওয়ালদের পারিবারিক অবস্থা আমাদের চেয়ে খারাপ। কিন্তু আমাদের অবস্থাও খুব বেশি ভালো ছিল না। গ্রামের মোটামুটি অবস্থাপন্ন গৃহস্থ বলতে যা বোঝায়। তবু আমার অহংকারী আব্বা আমাদের প্রেমকে মেনে নিলেন না।

আমার পক্ষে আওয়ালকে ছেড়ে যাওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। আমাদের প্রেম দীর্ঘ দিনের। তাছাড়া সুঠাম দেহের প্রায় পাচ ফিট দশ ইঞ্চির ইয়া লম্বা মানুষটার দিকে তাকালে প্রাণ জুড়িয়ে যেতো। কল্পনায় ওর বুকে চলে যেতাম। কিন্তু আমিও যে সে মেয়ে ছিলাম না। আমার লম্বা বাবার মতো এতো লম্বা না হলেও পাচ ফিট ছয় ইঞ্চি উচ্চতা নিয়ে গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের ওপর দিয়ে হাটা–চলা করতাম। আঠারো বছরের ভরাট স্বাস্থ্যের ভরা যৌবন যেন বর্ষা মরসুমের দুকূল ছাপিয়ে জল উপচে পড়া স্রোতস্বিনী নদী। সে জন্য কলেজ কম্পাউন্ড এবং কলেজে যাওয়া–আসার পথে অনেক মন্তব্য শুনতে হতো।

কেউ একজন বলতো, আর্মি ছাড়া শোয়াতেই পারবে না।

আরেকজন বলতো, আরে, আর্মিই লাগবে পাচজন।

গায়ের রঙ একেবারে ফর্শা না হলেও খুবই উজ্জ্বল। তাই আমাদের দুজনেরই দুজনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ।

একদিন ভোরবেলা সবাইকে ঘুমে রেখে আমরা চলে এলাম বাড়ি থেকে আট মাইল দূরে থানা সদরে। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের সহায়তায় কাজি অফিসে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ওই আত্মীয়ের বাসায় থাকতে লাগলাম। এর মধ্যে আব্বা অপহরণ কেস করেছেন। থানা পুলিশের কাছে আমার ছবি দিয়েছেন। আমাদের খোজে বাসায় এসে অবস্থান বুঝতে পেরেও না বোঝার ভান করে পুলিশ চলে যায়। নিরাপদ মনে না করে সে রাতেই অন্য এক আত্মীয়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে বাসে উঠলাম। বাস যখন গন্তব্যস্থলের অর্ধেক রাস্তায় এসে পড়েছে তখন পুলিশের গাড়ি বাসটি থামিয়ে আমাদের দুজনকে তাদের গাড়িতে উঠিয়ে থানায় নিয়ে আসে।

ও.সি এবং দুই এস.আই–এর সঙ্গে আওয়াল তর্কে জড়িয়ে পড়ে। ও যুক্তি দেখায়, আমরা প্রাপ্ত বয়স্ক এবং স্বেচ্ছায় বৈধভাবে বিয়ে করেছি, আপনারা আমাদের গ্রেফতার করে থানায় আটকে রাখতে পারেন না।

এ রকম আরো কিছু যুক্তি। কিন্তু ওর যুক্তি তাদের পছন্দ হয়নি।

ও.সি বলে, পারি।

তারপর সব কনস্টেবলদের ডেকে এনে ওর ওপর লেলিয়ে দেয়। সবাই মিলে লাথি, ঘুসি, বন্দুক ও রুলের পিটুনি দিয়ে শুইয়ে দেয়। অণ্ডকোষে এবং বুকে সজোরে লাথি মারে। আওয়ালের মুখ দিয়ে রক্ত আসে। আরো কিছু আঘাতে পরে ওর মৃত্যু হয়।

আমাকে থানার সঙ্গে লাগোয়া জানালাবিহীন একটা ছোট ঘরে নিয়ে যায়। সে রাতে প্রথমে ও.সি, তারপর দুই এসআই সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে আমার ভরা যৌবনের সুন্দর শরীরটাকে তীব্রভাবে দলিত–মথিত করে উপভোগ করে। সেই থেকে প্রতিদিনই ওই তিনজন কোনোদিন তিনবার কোনোদিন ছয়বারেরও বেশি ঘরটাতে আসতো। এবং আমার ওপর প্রাণওষ্ঠাগত ঝড় বইয়ে দিতো। তিনজনের ঘন ঘন পালাক্রমে আক্রমণে প্রথম দিকে আমার পাছা, যোনি, স্তন, ঠোট থেকে শুরু করে পেট, ঘাড়, কাধ তীব্র ব্যথায় অস্থির হয়ে ওঠেছিল। একটু ছুলেই প্রচণ্ড ব্যথা হতো। কিন্তু এর মধ্যেই ওরা এসে সর্বশক্তি দিয়ে মুঠি ভরে খামচে ধরতো। ময়দা পেষা পিষতো।

দুইজন কনস্টেবল খাবার সরবরাহ করতো। এদেরই একজন টয়লেটে বালতি ভরে পানি দিয়ে যেতো। সেখানেই গোসল করতে হতো। এদের কথায় বুঝতে পারি, আওয়ালকে হত্যার দায়ে আব্বা এবং বড় ভাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মাঝে মধ্যে ও.সি এবং দুই এস.আই এক সঙ্গে আসতো আমার কাছে। আমাকে দেখতো, পরামর্শ করতো। আমার দুঃসহ জীবনের দুই মাসের মাথায় এক রাতে ওরা এসে আমাকে হত্যার উদ্যোগ নিয়ে আবার থেমে যায়।

এক এস.আই বলে, তাহলে কেসটা বিপরীত হয়ে যায় এবং গোয়েন্দা তৎপরতাও শুরু হয়ে যাবে। নির্ঘাত। ও.সি বলে, কনস্টেবলদের কারো কারো দুই দুটো জ্বলজ্যান্ত অন্যায় হত্যার মানসিক ধারণ ক্ষমতা নাও থাকতে পারে। আর এটাকে যেহেতু আমরাই ভোগ করছি, আমাদের ওপর ক্ষোভ এবং ঘৃণা থাকাটা অসম্ভব নয়। আবেগ তাড়িত হয়ে জীবনের ঝুকি নিয়ে সব বলে দিতে পারে। ঝামেলায় গিয়ে কাজ নেই।

হত্যা না করার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক এস.আই–টি আমার কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, তাছাড়া এখন তো তরতাজাই আছে, আরো কিছুদিন আরামসে খাওয়া যাবে।

একটানা পাচ মাস আমার দেহটাকে ওরা তিনজন রক্তচোষা জোকের মতো উপভোগ করে। ছোট এস.আই–টা প্রতিদিন সামনে থেকে আমাকে জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল খাওয়াতো। কখনো কখনো জোর করে দুইটা তিনটাও খাইয়ে দিতো। হয়তো ভয় ছিল ওদের অবাঞ্ছিত সন্তান আমার গর্ভে বড় হয়ে পৃথিবীতে এসে যায়। শেষের দিকে দুই মাস ও.সি–টা আমার পাছা খামছে খামছে এক পর্যায়ে পায়ুপথে পুরুষাঙ্গ ঢুকিয়ে দিতো এবং দীর্ঘ সময় মন্থন করতো। তীব্র যন্ত্রণা হতো, ব্যথায় কলজে

ছেড়া চিৎকারে কাটা পাঠার মতো ছটফটাতাম। ও মাঝে মধ্যে আমাকে চিৎ করে শুইয়ে দাড়িয়ে পায়ের গোড়ালি দিয়ে আমার যোনি ঘষতো।

পাচ মাস পর প্রথমে কতোগুলো শাদা কাগজে আমার সাইন নেয়। তারপর কতোগুলো স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নেয়। স্বীকারোক্তিগুলো ছিল অনেকটা এ রকম, আমার আব্বা গুণ্ডা দ্বারা আওয়ালকে হত্যা করিয়ে আমাকেও গুণ্ডাদের দ্বারা নির্যাতন, ধর্ষণ করিয়েছেন আওয়ালদের দোষী সাব্যস্ত করার জন্য। পুলিশ আমাকে উদ্ধার করার পর আমার প্রিয় চাচারা আমাকে আমার ইচ্ছায় তাদের জিম্মায় নিয়ে যাচ্ছে।

তারপর ওসি এবং একটা এস.আই আমাকে গাড়িতে করে এখানে নিয়ে আসে এবং বদরাগী জাহেদা খালার হাতে তুলে দেয়।

সেই থেকে আমি পতিতা এবং প্রায় তেরো বছর যাবৎ আমার মণ-প্রাণের প্রিয়তম মানুষ আওয়ালের জন্য সযত্নে রাখা সুন্দর যৌবনটা শত পুরুষকে বিলাচ্ছি। প্রথম প্রথম খদ্দেরদের আমার কাহিনী বলে সাহায্য চাইতাম। কিন্তু কোনো সাড়া পেলাম না। পরে বুঝলাম প্রথম দিকে আমার কাছে উচু দামে টাকাওয়ালা, অসৎ মানুষদেরই পাঠাতো স্পেশাল গেস্ট হিসেবে।

এখন আর নিজ থেকেই ইচ্ছে করে না। কি হবে বাইরে গিয়ে? তবে ভিন্ন ধরনের কিছু ইচ্ছে মনে আসে। ইচ্ছে করে জগতের সকল পুরুষের মুখে থুথু মারতে। ইচ্ছে করে সমাজটার মুখে প্রস্রাব করে দিতে।

ঠিকানাবিহীন

*পারুল, আপনি যদি পুনর্বাসিত হতে চান তাহলে ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সকল গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। আপনার মঙ্গল কামনা করছি। –**যাযাদি***

চিন্তা

– লিসিয়া

আমি তাকে ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি। আজও মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। ছোট্ট একটা ভুলের জন্য সে আমার পৃথিবী থেকে উল্কার মতো হারিয়ে গেল।

এসএসসি-তে পড়ার সময় পরিচয়। এইচএসসি-তে শিক্ষক-কাম বড় ভাই থেকে সে হলো প্রেমিক। দুই পক্ষের ভালোবাসা। চিঠি ও কবিতা। সে বাসায় এলে পারিবারিক আড্ডায় চোখাচোখি। এরই মাঝে আমাদের থাকতে হতো।

ডিগ্রি পড়ার সময় একদিন খুব জোর করলো বাইরে যেতে। বললো, কথা আছে জরুরি।

আমার একটা অভ্যাস আছে। একবার না বলার পর আবার হ্যা বলতে লজ্জায় মরে যাই। সেদিন মুখ ফসকে অভিমানী না বলেছিলাম। ব্যস। আর হ্যা বলতে পারিনি তার শত অনুরোধেও। অথচ ভেতরে ভেতরে শতবার হ্যা বলছি। কি বুঝলো কে জানে?

ঢাকার বাইরে বন্ধুর বিয়েতে বেড়াতে গেছে। মনে আমার উপেক্ষার কষ্ট। সদ্য বিআইটি থেকে পাস করা এক টগবগে উচ্ছল যুবক। কনেপক্ষের এক মেয়ে তাকে খুব পছন্দ করলো। আমার প্রতি

সিরিয়াস ভালোবাসা দেখালো। তার ট্রেনের টিকেট ছিড়ে ফেললো। এ রকমই সে পরবর্তী কালে আমাদের পারিবারিক আড্ডায় বলেছে। ভয় ও লজ্জা বাদ দিয়ে তাকে চিঠি লিখেছি। হয়তো পায়নি। তবুও মনে হয় আমার হয়তো ভুলই হয়েছিল। কিন্তু সে ছিল আমার ছয় বছরের বড়। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার আগে একবার কি সে জানাতে পারতো না? পাপ মনে হঠাৎ মনে হয় একি অভিমান, নাকি প্রতারণা? আমি সর্বতোভাবে মনে করি, বিশ্বাস করতে চাই অভিমান। আমারই দোষ।

খুব দ্রুতই ওই মেয়েকে বিয়ে করলো। বিয়ের পর বৌ নিয়ে এসেছে। ছেলে হওয়ার পর ছেলে নিয়ে এসেছে। এমনিতে আমার বাসায় আসতো। আমার সঙ্গে সৌজন্য ছাড়া কথা বলতো না।

আজও আমি তাকে ভালোবাসি। এখন আমি ত্রিশ পার করেছি, চাকরি করছি। মনে হয় নজরুলকে *তুমি যখন এসেছিলে।* অথবা *সবই কি ছিল তোমার কথার কথা।* তারপরও বলবো, ভুল আমারই।

তার বিয়ের পর বেশ কয়েক মাস অসুস্থ ছিলাম। এরপর বহু ছেলে এসেছে পরিচিত হয়ে, প্রেম আসেনি।

তারপর প্রেম করলাম, বিয়ে করলাম, ছেলে হলো। সত্যিই সুখে আছি।

এরপরেও তাকে ভালোবাসি। আজও ভালোবাসি। খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় তাকে আবার আমি পাবো।

এ চাওয়ায় কোনো নোংরামি নেই। প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের কামনা নেই। আমার বা তার সংসার নষ্ট করার কোনো পরিকল্পনা নেই। শুধু আছে মানসিক এক শান্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা। তার অভিমান ভেঙেছে আমাকে আবার ভালোবাসে, ব্যস এই ভাবনাটুকু।

এই চাওয়াটা কি খুব পাপের হবে? আমি জানি, আমার চাওয়ায় কোনো পাপ চিন্তা নেই।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, ঢাকা থেকে

বিতৃষ্ণা

– মিনু

কিরণের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় পিকনিকে। কিরণ দেখতে সুন্দর ছিল আর কথাও বলতো খুব গুছিয়ে। তাই পিকনিকে উপস্থাপনার দায়িত্ব ছিল তার। পিকনিকে একটা মজার খেলা ছিল এ রকম : প্রতিটি মিথ্যা উত্তরের জন্য একটি করে চকলেট।

আমি সবগুলো প্রশ্নের উত্তর মিথ্যা দিয়ে অনেকগুলো চকলেট পেয়ে গেলাম। কিরণ বিজ্ঞের মতো বললো, আমাদের এই খেলায় এটাই প্রমাণিত হলো, মেয়েরা খুব মিথ্যা কথা বলে।

আমি বললাম, প্রকৃতপক্ষে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি মিথ্যা বলে। কিন্তু মেয়েরা খুব সহজ–সরল। তাই মেয়েরা মিথ্যা বললে ধরা পড়ে যায়। আর ছেলেরা এতো চালাক যে, এরা মিথ্যা কথা বললে কখনোই ধরা পড়ে না।

এ কথায় কিরণ কিছুটা চুপ হয়ে গেলেও পরমুহূর্তে একটা অদ্ভুত সুন্দর হাসি দিয়ে ব্যাপারটা এড়িয়ে গেল।

ছেলেদের কিছু কমন ডায়ালগ আছে। যেমন মেয়েদের মন বোঝা ভার। নারীর মন শত সহস্র জনমের ধন। ইত্যাদি।

এ ধরনের কথা শুনলেই আমার প্রচণ্ড রাগ লাগে। পিকনিকে কিরণও এক সময় বললো, *নারীর মন শত সহস্র জনমের ধন।*

তখন এগিয়ে গেলাম। অনেকটা বক্তৃতা দেয়ার মতো করে বলা শুরু করলাম।

যে কখনো আলো দেখেনি সে কি করে আলোর মর্ম বুঝবে। পুরুষ নামের এই জাতিটির মন বলে কিছু আছে কি না এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাই এরা সারা জীবন শুধু অন্যের মন নিয়েই গবেষণা করে গেছে। কিন্তু কোনো সন্ধান পায়নি। আর এদের অবসর কাটে নারীর দেহ, নারীর মন, নারীর রূপ নিয়ে গবেষণা করে যার কোনোটাই এদের নেই। মেয়েরা সমাজে নিজেদের অবস্থান, নিজেদের নিরাপত্তা নিয়েই ব্যস্ত। সেখানে পুরুষ জাতির মন বলে কিছু আছে কি না তা নিয়ে ভাবার সময় কোথায়। ছেলেদের উচিত অবসর সময়ে মেয়েদের নিয়ে গবেষণা না করে নিজেদের নিয়ে ভাবা আসলে এরা মেয়েদের কাছে কি চায়।

আমার এ ধরনের কথায় ছেলেরা একেবারে ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল। কিরণ তখন পরিস্থিতি অনুকূলে আনতে *নারী* কবিতাটি আবৃত্তি করা শুরু করলো। আমিও তার সঙ্গে আবৃত্তি করলাম।

এভাবেই কিরণের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সূচনা। কখন এই বন্ধুত্ব ভালোবাসায় রূপ নিল আমি নিজেও জানি না। তার সঙ্গে দেখা করার জন্য, তার সঙ্গে কথা বলার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। বাসায় বিভিন্ন রকম মিথ্যা কথা বলে কিরণের সঙ্গে ঘুরতে বের হতাম। আমাদের সময় খুব দ্রুত কাটতে লাগলো। এক সময় এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হলো। কিরণ মেসে থাকতো, কাজেই পরীক্ষার পর সে গ্রামের বাড়ি চলে গেল।

রেজাল্ট বের হলো। রেজাল্ট দেখে আমি হতবাক। কিরণ ফেল করেছে। এটা কি করে সম্ভব? কিরণ যথেষ্ট ভালো ছাত্র। তার সঙ্গে দেখা করার জন্য তার মেসে গেলাম। কিন্তু পেলাম না। একের পর এক চিঠি লিখেও কোনো উত্তর পেলাম না। আমার সঙ্গে কিরণ সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল। প্রচণ্ড ভেঙে পড়লাম। শুধু মনে হতো, আমার পাস করার কি দরকার ছিল? আমার বদলে কিরণ কেন পাস করলো না।

বেশ কিছুদিন পর কিরণের একটা চিঠি পেলাম। যার সারমর্ম এ রকম – পরিস্থিতির চাপে পড়ে কিরণ বিয়ে করেছে। কিন্তু সে এখনো আমাকে ভালোবাসে, আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

কিরণকে বেশ গুছিয়ে একটি চিঠি লিখলাম। তার সঙ্গে দেখা করা বা যোগাযোগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সে যাকে বিয়ে করেছে তাকে নিয়ে সুখে থাকুক। এরপরও কিরণ একের পর এক

ভালোবাসার মহাকাব্য পাঠাতে শুরু করে। আমার কোনো রেসপন্স না পেয়ে সে আমার বাসায় চলে আসে আমার সঙ্গে দেখা করতে। তখন ভাইয়া আর কিরণের মধ্যে যথেষ্ট কথা কাটাকাটি হয়।

এরপর কিরণ যেন একদম ক্ষেপা হয়ে গেল। প্রায় সময় বন্ধুদের নিয়ে আমাদের বাসার সামনে দাড়িয়ে থাকতো। আমাকে দেখলেই চিৎকার করে বলতো, আমি তোমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবো, দেখি কে ঠেকায়।

আমার তখন লজ্জা, অপমানে মরে যেতে ইচ্ছা করতো। এই কি সেই কিরণ যাকে ভালোবেসেছিলাম? এই কি তার ভালোবাসার নমুনা! আমিও তাকে ভালোবাসি। তাই বলে এতো উচ্ছৃঙ্খলতা? কিরণের উচ্ছৃঙ্খলতার সর্বশেষ পর্যায়ে সে আমাকে এসিড মারার হুমকি দেয়।

আমার বাইরে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। গৃহবন্দী হয়ে জীবন কাটাতে শুরু করি। বাবা, ভাইয়া আমার বিয়ের জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। খুব তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে হয়ে গেল।

কিন্তু কিরণকে তো আজও ভুলতে পারি না। তার সবগুলো চিঠি খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছি। কেন আমার সঙ্গে কিরণ এ রকম করেছিল যার জন্য আমাকে সামাজিকভাবে, পারিবারিকভাবে চরম অপমানিত হতে হয়েছে। আসলে প্রকৃতি ছেলেদের হাতে এতো ক্ষমতা দিয়েছে যে, এরা ইচ্ছামতো স্বৈরাচারী আচরণ করতে পারে।

আমি কি কোনোদিন কিরণকে ক্ষমা করতে পারবো? তার প্রতি প্রচণ্ড এক ঘৃণা, প্রচণ্ড এক বিতৃষ্ণা নিয়ে আমাকে বেচে থাকতে হবে।

সিরাজগঞ্জ থেকে

জোয়ার

– হোসেন এম মান্‌জিল

মেয়েটির নাম আনোয়ারা। যখন তার বয়স ছয় সাত তখন থেকেই তার রূপে আমি পাগল। শৈশব থেকেই সে ছিল খুব ঝগড়াটে। তাই তাকে আমি ভয় করতাম।

আস্তে আস্তে সে বড় হতে থাকে। আমিও তার সঙ্গে খাতির জমাতে চেষ্টা করি। কিন্তু তার কাছেই ঘেষতে পারছিলাম না। আমার এক বন্ধু বললো, ভালোবাসা কি জিনিস ও এখনো তা বোঝে না। যখন গায়ে যৌবনের জোয়ার আসবে তখন সাড়া না দিয়ে পারবে না। তবে ভালোবাসায় সফল হতে হলে লেগে থাকতে হবে।

আমি অপেক্ষা করতে থাকি। ক্রমে তার বয়স বারো হলো। বুকের দুপাশে কাপড় ঠেলে দুটো স্তন ক্রমেই উচু হয়ে থাকতে দেখলাম। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, সময় হয়েছে?

সে বললো, দেরি আছে, তবে চেষ্টা চালিয়ে যা।

যতোই দিন যায়, তার রূপ যেন ঠিকরে বের হয়। বাটা হলুদের মতো গায়ের রঙ, দেখে যেন সরিষা ফুলেরাও লজ্জায় মাথা নত করে। প্রভাত সূর্যের রশ্মির মতো তার রূপের শিখা চারদিকে যেন ছিটকে

পড়ে। পাড়া–প্রতিবেশী, আশপাশের গ্রামগুলোতে তার রূপের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। অনেক তরুণ এসে বাড়ির চারদিকে ঘুর ঘুর শুরু করে।

আমি একদিকে পাগল, অন্যদিকে এই ভেবে ভীত যদি অন্য কেউ এ কুসুম–কলি তুলে নিয়ে যায়! ভালো প্রস্তাব এলে গ্রামের মেয়েদের অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেয়। আমি বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারছিলাম না। কারণ আমি থাকি মামার আশ্রয়ে, খাই মামার, লেখাপড়া করি মামার পয়সায়। তার উপর মামাই তখনো বিয়ে করেননি। আমি তখন বি.এ পরীক্ষার্থী। আমার ইচ্ছে ছিল তার সঙ্গে খাতির জমাতে পারলে বলবো আমার জন্যে দুই বছর অপেক্ষা করতে। বি.এ পাস করে একটি চাকরির ব্যবস্থা হলেই তাকে বৌ করে ঘরে আনবো।

প্রেম করা দূরে থাক, তার কাছেও ঘেষতে পারলাম না। কেউ তার সঙ্গে একটু এদিক সেদিক কথা বললেই সে বাবা–মা তুলে গালি দেয়। তাই মনে যদিও ভালোবাসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল তবুও তাকে সে কথাটা বলতে পারলাম না।

একদিন সে তার দুই বান্ধবীকে নিয়ে তাদের পুকুরে পানিতে খেলছিল। ওকে দেখে আমিও সেখানে গোসল করতে যাই। আমার মাথায় তখন এক অদ্ভুত খেয়াল চাপলো। এক সুযোগে আমি ডুব দিয়ে গিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরলাম। সে তখন চিৎকার করে গালি দিতে দিতে আমার নাকে–মুখে খামচি শুরু করলো। তাকে ছেড়ে দূরে গিয়ে যখন পানির ওপর ভাসলাম তখন সে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে। চুপচাপ বাড়ি চলে গেলাম।

সে আমার পেছন পেছন গিয়ে মামার কাছে নালিশ করলো। সেদিন মার খাইনি ঠিকই। কিন্তু গালি যা খেয়েছিলাম তার চেয়ে মার খাওয়া ভালো ছিল।

তা সত্ত্বেও আনোর প্রতি আমার ভালোবাসা এতোটুকুও কমলো না, বরং আরো বেড়ে গেল। এর মধ্যে তার সারা অঙ্গে যৌবনের জোয়ার দেখা দিল। বুকের ব্লাউজটা ছিড়ে যায় যায় অবস্থা আর হাটার সময়ে তার নিতম্বে যেন বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা খেলা শুরু করে। তা দেখে আমার বুকেও শুরু হয় বৈশাখের ঝড়।

একদিন এক ফন্দি করলাম। বললাম, আনো, সোয়েটার বোনা শিখবে? যদি বলো তবে শেখাতে পারি।

হ্যা। বললো সে। সে আরো বললো, তুমি সুতা এবং বুননের কাটা এনে দেবে? আমি টাকা দেবো।

পরদিন আমি এক পাউন্ড উল এবং দুটো কাটা এনে দিয়ে বললাম, এগুলো তোমাকে গিফট দিলাম।

তাকে সোয়েটার বোনা শেখাতে লাগলাম। সেই সুযোগে একদিন তাকে আমার মনের কথাটা বললাম।

সে রাগও করলো না, সাড়াও দিল না। তিন দিন পর সে বললো, আজ বিকেলে একবার এসো।

সময় মতো আমি গেলাম।

সে তখন কোরআন তেলোয়াত করছিল।

আমি বসলাম।

পড়া শেষ করে কোরআন শরিফ বন্ধ করে সে বললো, প্রেম করা ভালো না। এতে ভীষণ পাপ হয়। যারা এসব করে, খোদা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেবে।

মন খারাপ করে চলে আসার জন্য উঠে দাড়ালাম। কোরআন শরিফ রেখে আমার কাছে এসে সে আস্তে করে বললো, আজ রাতে খাওয়ার পর আমাদের ঘরের পিছে গাব গাছটির নিচে এসো।

আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। বোকার মতো জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

সে তখন মুখ ভেংচি দিয়ে বললো, ইশ! উনি দুধের শিশু, কিছু যেন বোঝেন না।

সন্ধ্যার পরই গাবতলায় গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঘন জঙ্গল, মিশমিশে অন্ধকার, গা ঘামছে, মশায় কামড়াচ্ছে। সে আসছে না, এক এক করে তিন ঘণ্টা গেল। আমার তখন অসহনীয় অবস্থা। জীবনের প্রথম অভিসার, তাও বহুল কাঙ্ক্ষিত। চলেও আসতে পারছিলাম না। এক সময় শুকনো পাতার মচমচ শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা যখন কাছে এলো তখন আস্তে বললাম, আনো?

অমনি দৌড়ে পালালো এক শিয়াল দম্পতি।

আবার অপেক্ষা করতে লাগলাম। মিনিট পনেরো পর আবারও শুকনো পাতার মচমচ শব্দ শুনতে পেলাম। আমি হাত দিয়ে একটি ছোট ডাল নাড়লাম। মচমচ শব্দটা আমার কাছে এসে থামলো। আনো? ফিশ ফিশ করে জিজ্ঞাসা করলাম।

সে হাতের বদনাটা পাশে রেখে আমাকে জাপটে ধরলো। জীবনে এই প্রথম কোনো যুবতীর পরশ অনুভব করলাম। সে যে কি এক অনুভূতি তা লিখে প্রকাশের ক্ষমতা আমার নেই। সে আমার সারা অঙ্গে হাত বুলিয়ে বললো, ইশ! ঘেমে কি হয়েছে। অনেক কষ্ট হয়েছে না?

তোমার পরশ পেয়েই গা আমার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বললাম আমি।

তারপর সবই হলো। দুজনই আনাড়ি, তবু দুজনই মহাখুশি।

আমি বাড়ি ফিরে ডায়রিতে লিখলাম, আমার প্রেয়সীর গায়ে আজ যৌবনের জোয়ার ডেকেছে।

আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তাকে ধরে রাখতে পারিনি। কয়েকদিন পর হঠাৎ করেই সে মারা গেল। কিন্তু আমার ডায়রিতে সেই লেখাটা আজো আছে। ভালোবাসা দিবস কি তখন তা জানতাম না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আজ পরীক্ষা করে দেখি সে তারিখটা ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সাল।

ঢাকা থেকে

লাভ থ্রু ক্যালকুলেটর

– আবু তাহের

এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর অ্যাডমিশন টেস্টের প্রস্তুতি উপলক্ষে গণিত শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ছিলাম। হঠাৎ একদিন পড়ার টেবিলে এক নবাগতা সুন্দরীর ওপর চোখ পড়লো। প্রথম দিন দেখাতেই তাকে মনে মনে ভালোবেসে ফেললাম যাকে বলে একে বলে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। কথায় কথায় জানলাম নাম তার মিতা। স্থানীয় কলেজে এইচএসসি সায়েন্সের ছাত্রী। দুজন একই বিভাগের হওয়ায় কথাবার্তা টুকটাক ভালোই হতো। আমার পরীক্ষার রেজাল্ট বের হওয়ার পর কথা

বলাটা যেন হঠাৎ করেই একটু বেড়ে গেল। কতো দিন রাস্তায় একত্রে গল্প করতে করতে অনেকখানি হেটেছি। কিন্তু কিছুতেই বলা হয়ে ওঠেনি মনের মধ্যে লুকানো কথাটি।

কিভাবে বলা যায় এ চিন্তা করতেই মাথায় হঠাৎ এক আইডিয়া কাজ করলো। আমি যে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করি তাতে ইংরেজি প্রায় সব কয়টি বর্ণই লেখা যায়। পরদিন পড়ার টেবিলে তার পাশে বসে ক্যালকুলেটরে লিখলাম, MITA MY CHOICE. I LOVE MITA. লিখে তার সামনে ক্যালকুলেটরটি খুলে রেখে দিলাম।

এক সময় ক্যালকুলেটরের লেখাটি তার চোখে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলো, কে এটা লিখেছে।

পাশ থেকে আমার এক বন্ধু জবাব দিল, যার ক্যালকুলেটর সেই লিখেছে।

তখন সে আমাকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করলো, এই ক্যালকুলেটর আপনার?

আমার জবাব ছিল হ্যা বাচক।

এরপর সে বই-খাতা গুটিয়ে বাসায় চলে গেল। আমি তো মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। বেশ কয়েকদিন তাকে পড়ার টেবিলে দেখি না।

হঠাৎ একদিন হাজির হয়ে বললো, ওভাবে লেখার কি দরকার ছিল। আমি তো এমনিতেই বুঝতে পেরেছিলাম।

এখন আমরা এক সঙ্গে হাটি, গল্প করি। নতুন নতুন স্বপ্নের জাল বুনি, ভবিষ্যতের পৃথিবীটাকে আরো সুন্দরভাবে সাজানোর পরিকল্পনা করি।

ভাংগুড়া, পাবনা থেকে

বেদনার অতীত

– লাভলী

ঢাকার নামকরা ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলের একই ক্লাসের ছাত্রী ছিলাম আমরা তিন বান্ধবী। নাহিদ, আমি, রিনা। ধানমন্ডির দুটি পাশাপাশি বাসার বাসিন্দা আমি আর নাহিদ, রিনার বাসা শ্যামলীতে। সবেমাত্র ক্লাস টেনে উঠেছি। দেহ-মনে যৌবনের আগমনী সংকেত প্রকাশ পাচ্ছি। পাশের বাসার সাইফুলভাইকে জানালা দিয়ে প্রায় দেখতাম। তবে কখনো চোখে চোখ পড়েনি। নাহিদের কাজিন সাইফুল খান আমাদের তিন বছরের সিনিয়র। এ বাড়িতে থেকে তখন কলেজে পড়তো। বসুরহাট সংলগ্ন খানবাড়ির ছেলে সাইফুলভাই খুবই ভদ্র ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক যুবক। এ যুবককে নিয়ে আমার জীবন থেকে নেয়া গল্পটি।

মনে পড়ে ওই বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ভালোবাসা দিবসের গোধূলীলগ্নে নাহিদই তার সাইফুলভাইয়ের সঙ্গে ওদের বাসায় আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিল। যদিও দিবসটির সার্থকতার জন্য নাহিদ দুষ্টুমি করে তার সাইফুলভাইয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করে দিল। তবে এ সুদর্শন যুবক, স্মার্ট, মিষ্টিভাষী সাইফুলভাইকে প্রথম দর্শনে আমার ভালো লেগেছিল। কেন যে নিজের অবচেতন হৃদয়ে তাকে তখন হঠাৎ করে স্থান দিলাম তা নিজেও জানি না। বিশেষ করে ওর ঘন কালো

কোকড়ানো চুল, গোলাপি ঠোঁটের মাঝে লুকানো উজ্জ্বল হাসিমাখা দৃষ্টি আমার হৃদয়কে খুব নাড়া দিয়েছিল। দুটি বাসা কাছাকাছি ছিল বলে স্লিম গড়নের এ চঞ্চল যুবকটির সঙ্গে কথা বলার জন্য মনের মাঝে কিছুটা কৌতূহল আর দুষ্টুমি ভর করতো। তাই সুযোগ পেলেই গ্রামার কিংবা অহেতুক কোনো বিষয় নিয়ে তাকে বিরক্ত করতে ভালো লাগতো। ব্যাপারটি আন্টি না বুঝলেও নাহিদ বুঝতো।
বিকেলে সাইফুলভাইকে ক্রিকেট মাঠে দেখার জন্য আবাহনী মাঠের চারদিকে ঘুরতাম। মাঝে মধ্যে ফুটবল খেলতেও দেখেছি। তবে ধানমন্ডি ক্লাবের নিয়মিত ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিল ও। তাই সুযোগ পেলে কিছুক্ষণ মাঠের পাশে বসে ওর খেলা দেখতাম। একদিন খেলা শেষে ম্যান অফ দি ম্যাচের পুরস্কার হাতে উৎফুল্ল সাইফুলভাইকে দেখে কি যে মুগ্ধ হয়েছি, অথচ তার সামনে গিয়ে ধন্যবাদ জানানোর মতো সাহস আমার ছিল না। তাকে আমার অপ্রকাশিত কথা প্রকাশ করার সুযোগটুকু না পেয়ে নিজের বিষণ্ন হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হতে লাগলো। নিজেকে সাহসী, সুন্দরী কিংবা বিত্তশালী পরিবারের একমাত্র আদরের কন্যা ভাবতে বড় কষ্ট হয়।
সাইফুল অজানা কারণে একদিন ধানমন্ডি ছেড়ে শ্যামলীতে চলে গেল। খেলার মাঠেও তাকে আর দেখি না। তখন নিজ মনে ওর অভাব আর আমার ব্যর্থতার গ্লানি আমাকে নীরবে ব্যথিত করতো। কয়েকটি বছর পেরিয়ে গেলেও আমার ভালোলাগার অপ্রকাশিত যুবকটিকে হৃদয় থেকে মুছতে পারিনি। এ এক কঠিন বাস্তবতা।
এখন অনেক বড় হয়েছি। সবেমাত্র অনার্স ফাইনাল দিলাম। ইটালি দূতাবাসে চাকরিতে যোগ দিতে আব্বু রোম চলে গেলেন। আমি আর আম্মু ঢাকায় থেকে গেলাম। পরদিন বিকেলে নাহিদদের বাসায় গিয়ে সাইফুলভাইকে দেখে বিস্মিত হলাম। এ যেন বিনা মেঘে বৃষ্টি নামার মতো। আর আমাকে দেখে সাইফুল অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। দুজনই যেন সংবিৎ হারিয়ে ফেলেছি।
তুমি নিশ্চয়ই লাভলী? মাথা নেড়ে জবাব দেয়ার সঙ্গেই বলে ফেললো, অনেক বড় হয়ে গেছো, তোমাকে কতোদিন পর দেখেছি বলো তো? বেশ সুন্দর লাগছে তোমাকে দেখতে।
কিছুটা লজ্জা বোধ করলেও ওর উক্তিগুলো আমাকে যে কি আনন্দিত করেছে তা বুঝতে পারছিলাম। আমি ওর পাশে বসলাম।
ওপাশে বসা নাহিদ বললো, জানিস, সাইফুলভাই নতুন চাকরিতে যোগ দিয়েছেন ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ে।
সংবাদটি শুনে আরো মোহিত হলাম, ভালোভালাগার এতো কিছু এক সঙ্গে পেলে কার না ভালো লাগবে? আজ নিজেকে ওর সামনে সাহসী করে তুলেছি। নাহিদ সুযোগ দিল। তাই সাইফুলভাইকে আজ বলতে পেরেছি এই যে মিস্টার খান, এতোদিন কোথায় ছিলে? উত্তর না পেলেও আমার ভালোলাগার হাসিটুকু ওর থেকে পেয়েছি।
বাসায় আমরা এ তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই। এমন একটি একন্ত মুহূর্তের সুযোগ করে দেয়ার জন্য সৃষ্টিকর্তাকে মনে মনে ধন্যবাদ। নাহিদ তার রুমে চলে গেল। এ রুমে আমরা দুটি দেহ-মন পাশাপাশি থেকে দুটি মনের ভালোলাগার অনুভূতি প্রকাশ পাচ্ছিল। অনেক ভাব বিনিময় হলো। আমাদের বন্ধুত্বের সূচনা হলো। শুরু হলো হালকা প্রেম, তাও শুধু মাঝে মধ্যে টেলিফোনে।

দিন–রাতে কিংবা একান্ত মুহূর্তে ওর দুই একটি কথা আমাকে পুলকিত করতে লাগলো। তুমি আমার পুতুল রানী, শাড়ি পরা ডানাকাটা পরী, রাজকুমারী, তুলতুলে বৌ, ছুয়ে দেখবো নাকি ইত্যাদি। এখন আরো সাহসী হলাম। মাঝে মধ্যে সাইফুলের সঙ্গে কৃসেন্ট লেকের পাড়ে, জিয়ার মাজার সংলগ্ন লেকের ধারে ছুটির দিনে বোটানিকাল গার্ডেনের নির্জন স্থানে ওর বিশ্বস্ত কোলে মাথা রেখে আদর নিচ্ছি।

একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করেছি, বলো তো আমার এতো পোশাক থাকতে আমাকে শাড়ি পরলে তোমার এতো ভালো লাগে কেন?

বলেছিল, শাড়ি পরলে আমাকে ওর মিসেসের মতো লাগে। শাড়িতে লুকানো আমার অঙ্গ, নাভি, সবই তার দৃষ্টিতে আকর্ষণ করে তুলে।

শোনো মিস্টার খান, শাড়ির আরো একটি বিশেষ গুণের কথা তোমার জানা নেই। এ শাড়ি গলায় জড়িয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে থাকতে সুবিধা হয়। মনে রেখো, যদি তোমাকে চিরদিন এভাবে না পাই তাহলে এ সুবিধার কাজটিই করে ফেলবো।

ওরে দুষ্টু! এ কথা বলে তার গোলাপি ঠোটের চাপ সেদিন প্রথম আমার কপালে বসিয়ে দিল।

আমিও তার ঠোটে।

বললো, চলো আজ আর নয়।

একদিন দুপুর খবর এলো, নানু খুবই অসুস্থ। বিন্দুমাত্র সময় দেরি না করে আম্মু নানুবাড়ি চলে গেলেন। আমি ইচ্ছে করে সঙ্গে যাইনি। কারণ সাইফুলকে একান্তভাবে কাছে পাবার সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইনি। আম্মুকে বলেছি, আমি বুয়াকে নিয়ে বাসায় থাকতে পারবো। সাইফুলকে ফোনে বলেছি, অফিস থেকে সরাসরি আমাদের বাসায় চলে এসো। জরুরি কাজ আছে। ফোনে বলা যাবে না।

আমার কোনো বিপদ ভেবে চলে এলো। নির্জন বাড়িতে এ প্রথম এসে কিছুটা শংকিত হলো। চলে যেতে চাইলো, যেতে দিলাম না।

সোফায় ওর কোলে মাথা রেখে কতো না বলার কথা বলেছি। কখন যে রাত নয়টা বেজে গেল তা টের পাইনি। যখন বুয়া টেবিলে রাতের খাবার দিয়ে বলছে, আপু, কবে খাবেন, তখন টের পেলাম। নিজ হাতে ওকে খাবার পরিবেশন করতে পেরে আজ অনেক তৃপ্তি পাচ্ছি। এ যেন এক নব দম্পতির নবান্নের একান্ত আয়োজন। রাত গভীর হচ্ছে। তাই ও নিজ বাসায় চলে যেতে চাইলো। বললাম, ভয় পাচ্ছো নাকি? এ বুঝি তুমি! আজ তোমার সঙ্গে গল্প করে রাতটি কাটিয়ে দেবো, কি বলো?

খাটে বসা সাইফুলের কোলে মাথা রেখে শুয়ে রয়েছি। আমার মাথার ওর আলতো হাতের ছোয়ায় আদর অনুভব করছি। তখন আমার প্রতি ওর মুগ্ধ দৃষ্টি আর তার প্রতি আমার গভীর ভালোবাসার মাদকতায় যেন পুলকিত হচ্ছি। দুটি মনের স্নিগ্ধ কামনার অনুভবে, ওর গায়ের সৌরভে আমার আপাদমস্তকে এক প্রকার শিহরণ জাগছে। চিরদিন এভাবে একান্তে ওর সঙ্গ পাবার কামনায় তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। মনের আনন্দে চোখের পানি গড়িয়ে পড়ছে। তার হাতের ছোয়ায় আমার কামনা অশ্রু মুছে গেল।

এ নিঝুম নিশিথে ও আমাকে আদর করছে। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিচ্ছে, এ যেন এক নবজাগরণ। আমার আবরণী দেহ ওর কাছে উন্মুক্ত করতে বিবেক কোনো বাধা দিচ্ছে না। প্রিয় রাজকুমারের হাতের স্পর্শে আমার সমগ্র দেহের আবরণী ক্রমাগত সরে যাচ্ছে, আমিও ওকে বিবস্ত্র করে নিচ্ছি। এক চরম অনুভূতি যা দুজনকে সুখের সাগরের প্রবল জোয়ারের স্রোতে ভাসিয়ে দিচ্ছে। এতে কি যে আনন্দ, কি যে মধুর মিলনের তৃপ্তি যা আগে কখনো অনুভব করিনি।

এখন দুটি দেহ ক্লান্ত। জানি না এর চেয়ে আনন্দের বাসর রাত কারো জীবনে আর এসেছিল কি না। রাত আরো গভীর হলো, দুটি দেহ-মন আরো উত্তেজিত হলো, ক্রমাগতভাবে চলছে আনন্দের খেলা। আবারও সকালে ও বিদায় নিল, ছেড়ে দিতে মন চায় না।

মাঝে মধ্যে নির্জন পুরীতে এভাবে ওকে না পেলে অস্থির হয়ে যেতাম। যখনই পেতাম তখনই দুটি ঠোটে ঠোট, হাতে হাত, পায়ে পা রেখে দুটি দেহ-মন এক সঙ্গে মিশে যেতো এক স্বর্গীয় সুখের অনুসন্ধানে যা কি না দুজনার চরম আনন্দের আর মধুর তৃপ্তির শেষ বিন্দু পর্যন্ত বিচরণ করতো। তখন আমরা অপ্রকাশিত স্বঘোষিত দম্পতি। সুযোগ এলেই চলতো আমাদের বাসর রাতের উন্মাদনা, এতে খুজে পেতাম নব নব অভিজ্ঞতা।

সাইফুল বললো, এভাবে আর নয়, *কবুল* নামের শব্দটি পাঠ করা উচিত। আমার মতামত চাইলো। সিদ্ধান্ত নিলাম, আগামী মাসের ১৪ তারিখ অর্থাৎ ভালোবাসা দিবসে মগবাজার কাজি অফিসে গিয়ে স্বীকৃতি কাজটুকু সেরে নেবো। হাতে এক মাস সময়, দুজনের সব কেনাকাটা নিজ পছন্দে সেরে নিলাম। বিয়ের পর বাধা আসলে প্রয়োজনে দুজন দেশান্তর হবো। জমানো সব টাকা ড্রয়ারে তুলে রেখেছি। বলে রাখা ভালো, আমাদের এ ভালোবাসা বান্ধবী রিনা সহ্য করতে পারতো না। যদিও আগে অনুভব করেছি। তবে এটা গভীরভাবে ভেবে দেখিনি।

আমাদের বিয়ের প্রস্তুতির ব্যাপারটি রিনা কিভাবে টের পেল, তা জানি না। রিনা আম্মুকে ফোনে কি বলেছিল তাও জানি না। কারণ সাইফুলকে ভালোবেসে কাছে পাবার জন্য রিনার হৃদয়ে যে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল তাও বুঝতে পারিনি। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! আমি নিজ গৃহে বন্দী হলাম। সেনা কর্মকর্তা মামা এসে আমাকে অকথ্য বকাবকি আর ধমক দিয়ে শাসন করে গেলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, প্রয়োজনে আমার রাজকুমারকে আমার স্বপ্নের পৃথিবী থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে।

না, না এ হতে পারে না। নিজেকে হারাতে পারি, আমার স্বপ্নের মানুষটিকে নয়। বাধ্য হয়ে শত ভয় আর হাজারো উৎকণ্ঠার মাঝে নীরবে অবরুদ্ধ থাকলাম। তখনো স্বৈরাচারী এরশাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়। স্বৈরাচারীর দোসররা দিনকে রাত বলে প্রচার করতো। তারা যা ইচ্ছে তা করতে কুণ্ঠিত হতো না, মামা তো তাদেরই একজন।

সাইফুলকে মন্ত্রণালয় থেকে প্রথমে রাজশাহী জেলা ত্রাণ কার্যালয়ে এবং কিছুদিন পর ভোলায় বদলি করা হলো তাও দায়িত্বের অবহেলা আর সরকারি টেলিফোনের অপব্যবহারের কারণ দেখিয়ে। এ ষড়যন্ত্রে মন্ত্রণালয়ের এক কর্তা এবং মামা নেপথ্যে ছিলেন। আমি নিঃসঙ্গ, আমার সকল আশার প্রদীপ নিভে যেতে লাগলো।

আমার স্বপ্নের মানুষটিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তারা ক্ষান্ত হলো না। জানতে পেলাম, আমাকে নিয়ে আম্মু ইটালি পাড়ি দেবেন। প্রতিরোধ করার কোনো অবলম্বন আমার নেই। আমি তো এখন শক্তিহীন এক জীবন্ত লাশ মাত্র।

হায়রে সমাজ, হায়রে অহংকার। এ নিষ্ঠুর পৃথিবীর খোলা চাদের নিচে আমি বড় অসহায়। শাড়ি পেচিয়ে নিজকে শেষ করলে তো সাইফুলকে পাচ্ছি না। ও কষ্ট পাবে। তাই নীরবে সবই মেনে নিতে হচ্ছে। জানি সাইফুলও এখন যন্ত্রণায় আছে।

সাইফুল আমার যাবার দিন–ক্ষণ ও ফ্লাইট নাম্বার জানতে পেরেছে। জিয়া বিমানবন্দরে আমাকে সি অফ করতে এলো গোপনে। দূর থেকে বিষণ্ন বদনে, অশ্রু ভেজা চোখে ওকে দেখেছি। ইমিগ্রেশনে যাওয়ার আগে বাধা উপেক্ষা করে বাইরে দাড়িয়ে থাকা সাইফুলকে জড়িয়ে ধরেছি।

ও পাথর হয়ে থাকলো।

বিদায়ের সময়ে বলেছি, সাইফুল তুমি আমার জীবন, আমার মরণ, সর্বত্রই শুধু তুমি। এ কথা জেনে রেখো, তোমার লাভলী চিরদিন তোমারই থাকবে। যদি বেচে থাকি সেটি শুধু তোমার জন্য। বিদায়ের দৃশ্য ভীষণ যন্ত্রণার।

ও আমাকে কথা দিয়েছিল চিরকাল আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

ইটালিতে এলাম। শিল্পীর তুলিতে আকা, স্থপতিদের মেধার বাস্তবায়নে আর প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্যের এক মনোরম রোম নগরী। শত শত নর–নারী, যুবক–যুবতীর বাধাহীন বিচরণের মাঝে প্রতিটি মুহূর্তে শুধু সাইফুলকে অনুভব করেছি। সর্বদা ওর অভাব আমাকে বিচলিত করেছে। চিঠিতে কিংবা ফোনে ওর সঙ্গে আলাপ হলে কি যে ভালো লাগতো যা বুঝতে পারতাম না যেন এখনো আমার বুকে জড়িয়ে আছে, অথচ ছুয়ে দেখতে পারছি না। কয়েকটি বছর কাটিয়ে দিলাম এ প্রবাস জীবনে। এখানে ডিগ্রি পেলাম। ইটালির নাগরিক হলাম। সাইফুলের ভালোবাসার প্রতি, ওর প্রতি আমার বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র ঘাটতি ছিল না। বাস্ততার কারণে দেরিতে যোগাযোগ হচ্ছে।

এখন আমি স্বনির্ভর। রোমে ভালো চাকরি করি। আমাকে বাধা দেয়ার কেউ নেই। আব্বু পরকালে চলে গেছেন এক বছর আগে। দেশের মাটিতে চিরনিদ্রায় শায়িত। ছয় মাস আগে আম্মুও আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন, নিজ স্বামীর পাশে শুয়ে আছেন। আব্বু আর আম্মুকে শেষ দেখেছি রোম থেকে দেশে যাওয়ার সময়। এতো ছিল শেষ দেখা। যদিও রোমে আমি সেই প্রথম তাদের কাছে মাত্র এক মাস কাটিয়েছিলাম।

দীর্ঘ দিন সাইফুলের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে না। ভাবলাম অভিমান করেছে। সিদ্ধান্ত নিলাম এবার দেশে গিয়ে ওর অভিমান ভাঙবো, আমি আমার কথা রাখবো। ওর সঙ্গে সুখের ঘর বেধে এবার দুজন রোমে পাড়ি দেবো। নিজের সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত বাস্তবায়ন নিজেকেই করতে হবে। কারণ দেশের স্বৈরাচারীর দোসররা এখন আর দাপটে নেই। প্রস্তুতির পালা শেষ, পরিকল্পনার পালাও শেষ, এবার প্রিয় মাতৃভূমিতে পদার্পণের পালা।

১ ফেব্রুয়ারিতে প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরলাম। দেশ অনেক সুন্দর লাগছে, হয়তো আমার সাইফুল আরো সুন্দর হয়েছে। এসব অনুভূতি মনকে মধুর করে তুললো। ঢাকায় এসে খবর পেলাম সাইফুল এখন চট্টগ্রামে বদলি হয়েছে। ওকে না জানিয়ে তার কর্মস্থল চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিংয়ে উঠলাম। এটা করেছি

আমার উপস্থিতি ওকে বিস্মিত করার জন্য, ওর কষ্টের নদীতে সুখের পাল তোলা নৌকা ভাসিয়ে দেয়ার জন্য।

ওর অফিসারের রুমে গিয়ে জানতে পেলাম, দুদিনের ছুটি নিয়ে সাইফুল ভোলায় গেছে। আরো জানতে পেলাম, দ্বীপ জেলা ভোলার এক গ্রামের চৌধুরী বাড়িতে বেড়াতে গেছে। সে এখন ওই চৌধুরী বাড়ির এক কাজলবধূর সঙ্গে সুখের ঘর বেধেছে।

যদিও আমার অতীত শুধু এক বেদনার স্মৃতি। তবু আমি ওর প্রতীক্ষায়।

রোম, ইটালি থেকে

সামনের মাস

– মাহবুব রেজা

আমি যখন নিজের কাছে গভীরভাবে ডুবে থাকি তখন অন্য মানুষ হয়ে যাই। সব সময় মনে হয় এভাবে থাকলে ভালোই হতো। কিন্তু এভাবে বেশি দিন থাকা যায় না। কারণ আমার মেয়ে। আমার মেয়ের নাম রেবেকা সারা। আমার মেয়েকে আমি আথৈই বলে ডাকি। মেয়ের নাম প্রথম যখন অথৈই রাখলাম তখন সবাই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারলো না। অথৈই এটা আবার কেমন নাম?

আমার স্ত্রী পর্যন্ত মৃদু প্রতিবাদ করে উঠলো, আমার মেয়ের নাম অথৈই রাখার শানে নযুল কি জানতে পারি?

আমার স্ত্রী সাধারণত আমার কোনো কাজে খবরদারি করার দুঃসাহস রাখে না। আমার বদমেজাজের জন্য সে কম বেশি পরীক্ষিত। স্ত্রীর কথা শুনে বেশ স্বাভাবিক উত্তর দিলাম। মেয়ে যখন হয়েছে, তাও আবার বাংলাদেশি তখন হয়তো আমার মেয়েকে অদূর ভবিষ্যতে অথৈ সাগরে পড়তে হতে পারে। তাই এই নাম রেখেছি। আমার মেয়ের এই নাম যদি তোমাদের ভালো না লাগে তাহলে তোমরা নির্দ্বিধায় অন্য নাম রাখতে পারো।

এরপর থেকে আর কোনো কিছু হয়নি। তারপর থেকে সবাই আমার মেয়েকে অথৈ নামে ডাকে।

আজ আমি সুদূর প্রবাসে। দেশ থেকে যখন এখানে চলে এলাম তখন দেশের কথা মনে হলে খুব খারাপ লাগতো, বিশেষ করে মেয়ের কথা মনে হলে মনে হয় সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যাই দেশে। যেদিন চোরের মতো দেশ থেকে পালিয়ে চলে এলাম তার আগের দিন রাতে আমার মেয়েকে বললাম, বাবা বিদেশ চলে যাবে মা।

আমার সাড়ে তিন বছরের মেয়ে বললো, না বাবা, তুমি বিদেশ যাবে না।

আমি আবার বললাম, বাবা বিদেশ চলে যাবে।

আমার মেয়ে আবার বললো, না বাবা, তুমি যাবে না।

আমার বুকে মাথা রেখে আমার মেয়ে, ফুলের মতো মেয়ে বললো, তুমি আমাকে রেখে বিদেশ যাবে না। বলতে বলতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে কেদে উঠলো।

আমার চোখে তখন জল।

আমার স্ত্রী এসব শুনে আর চুপ থাকতে পারলো না। সে বলে উঠলো, মেয়েটাকে তুমি আরো খারাপ করে ফেলবে, ঘুমাও তো, কাল সকালে তোমার ফ্লাইট।

তারপর চেক রিপাবলিক, জার্মানি, ফ্রান্স হয়ে ইটালি। পথে কতো অভিজ্ঞতা, ঘটনা, স্মৃতি। আমার মেয়েকে ছাড়া এক রাতও ঢাকার বাইরে থাকতে পারি না। আর সেই আমি মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এই প্রবাসে দিন কাটাচ্ছি। মিলান অনেক বড় শহর। সারাদিন কাজ করে রাতে যখন ঘরে ফিরি তখন মেয়ের কথা মনে হয়। মিলানের আকাশে আমার মেয়ের ছবি দেখি।

এখনো ফোন করলে আমার মেয়ে অভিমান ভরা কথা বলে। বাবা, তুমি কবে আসবে?

আমি বলি, সামনের মাসে আমি দেশে আসবো।

মেয়ে বলে, বাবা, তোমার সামনের মাস কবে হবে?

আমার মেয়ের কথার কোনো জবাব দিতে পারি না। নিজেও জানি না, আমার মেয়ের কাছে কবে আমি আসতে পারবো। মেয়ের জন্য আমার যে কেমন করে তা জানি না।

খুব ছোটবেলায় আমার মাকে হারিয়েছি। আমার মেয়ের মাধ্যমে আমার হারিয়ে যাওয়া মাকে খুজে পেয়েছি বাইশ বছর পর। আমার মেয়ে যেন অবিকল আমার মা। আমার মাকে খুব বেশি ভালোবাসি যেটা তখন প্রকাশ করতে পারিনি।

খুব ছোটবেলায় সৃষ্টিকর্তা আমার মাকে নিয়ে গেছে। এ কারণে আমার ভালোবাসা দেখাতে পারিনি। এখন আমার মেয়ের ভেতর আমার মাকে পেয়েছি। কি অদ্ভুত!

আমি সব সময় সামনের মাসে আসবো, সামনে মাসে আসবো বলে যখন আসছি তখন আমার মেয়ে তার মাকে বলেছে, বাবা আসে না কেন? বাবা আসে না কেন?

আমার স্ত্রী আমাকে ফোনে বলে, তোমার মেয়ের কান্না দেখে আমি ভিরমি খাই। তোমার মেয়েকে তুমি কিছু বলো। সারাদিন শুধু বলে, বাবা আসে না কেন? আমার বাবা আসে না কেন?

ফোনে আমার মেয়েকে কিছু বলি না, বলতে পারি না। শুধু চোখ ভেসে যায় চোখের জলে।

athai992002@yahoo.com